গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৭ বর্ষ ১১ সংখ্যা ৮ অক্টোবর ২০০৪ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

ভারতে পেট্রোপণ্যের দাম এত বেশি কেন

গত ২৪ বছরে এ দেশে পেট্রল-ডিজেলের দাম বেড়েছে ৬৮ বার, গড়ে বছরে প্রায় ৩ বার। সিপিএম সমর্থিত কংগ্রেস সরকার এই রেকর্ড প্রায় ভেঙে দেওয়ার মুখে। এদের দু-মাসের রাজত্বে ইতিমধ্যেই দু-বার পেট্রল-ডিজেল, একবার রান্নার গ্যাস ও কেরোসিনের দাম বেড়েছে এবং শোনা যাচ্ছে আবার নাকি রান্নার গ্যাস ও কেরোসিনের দাম বাড়বে। গ্যাস সিলিন্ডারের সিকিউরিটি ডিপোজিটের টাকাও নাকি প্রায় দ্বিগুণ করা হবে। এছাড়া তেল কোম্পানিগুলিকে এই অধিকার দিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, প্রতি পনের দিন অন্তর তারা তেলের দামের পর্যালোচনা করতে পারবে এবং প্রয়োজনে দশ শতাংশ পর্যন্ত মূল্যবৃদ্ধি করতে পারবে। এর সুযোগ নিয়ে এইসব তেল কোম্পানি আরও কতবার পেট্রোপণ্যের দাম বাড়াবে তা ভবিষ্যতেই আমরা দেখতে পাব।

তেলের অস্বাভাবিক এই মূল্যবৃদ্ধিকে কেন্দ্র করে প্রতিবারই বুর্জোয়া রাজনীতির একটা নোংরা খেলা আমরা দেখতে পাই। বিজেপি সরকার দাম বৃদ্ধি করলে কংগ্রেস হুংকার ছাড়ে, কংগ্রেস বাড়ালে বিজেপি বিরোধিতার ভান করে। এই খেলা এবারও আমরা দেখতে পাচ্ছি। কংগ্রেস সরকারের তেলের মূল্যবৃদ্ধির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিজেপি সরব হয়েছে এবং পশ্চিমবঙ্গে বসে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আন্দোলনের হুংকার দিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন। বুর্জোয়া সংবাদ মাধ্যমগুলিতে ফলাও করে তা ছাপা হয়েছে। সিপিএমের ভূমিকাও প্রতারণামূলক। কংগ্রেস সরকারের সমস্ত জনবিরোধী সিদ্ধান্তের তারা একদিকে মন্ত্রণাদাতা, অন্যদিকে সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য 'এইভাবে তেলের দাম বাড়ানো চলবে না' জাতীয় কথা বলে তারা বাজার গরম করার চেষ্টা করছে।

তেলের মূল্যবৃদ্ধির জন্য বরাবর যে যুক্তি খাড়া করা হয় এবারও সেটাই করা হচ্ছে। যুক্তিটা মোটামুটি এইরকম, ''সরকারের কিছু করিবার নাই, কারণ পেট্রোলিয়ামের জন্য ভারত আমদানি নির্ভর। আন্তর্জাতিক বাজারে দাম বাড়িলে তাহাকে বাড়তি দর গণিয়া দিতেই হইবে। ···নির্মম সত্য ইহাই যে পশ্চিম এশিয়ায় আগুন জ্বলিলে ভারতও তাহাতে পুড়িবে। চিদম্বরম সাফ বলিয়াছেন, তিনি নিরুপায়।'' (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৪-৮-২০০৪)

অর্থাৎ (১) আমাদের দেশ আমদানি নির্ভর এবং (২) আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম ক্রমাগত বাড়ছে। সুতরাং যা হবার তা হবেই — তেলের দাম বাড়বেই, সরকারের কিছু করার নেই। জনসাধারণের উচিত বিক্ষোভ আন্দোলন না করে একে অবশ্যম্ভাবী ভবিতব্য হিসাবে মেনে নেওয়া। কিন্তু আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম ক্রমাগত কমতে কমতে যখন ব্যারেল প্রতি ১৬ ডলারে দাঁড়িয়েছিল, তখন এদেশে দাম না কমে কেন বারবার বেড়েছিল? কিংবা সম্পূর্ণ আমদানি নির্ভর হওয়া সত্ত্বেও পাশের দেশ বাংলাদেশে তেলের দাম আমাদের তুলনায় কেন অনেক কম? বাড়ার পরেও আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের যা দাম, কেন

সাতের পাতায় দেখুন

দিল্লিতে এ আই ডি এস ও'র বিশাল ছাত্রমিছিল

দাবি বিবেচনার প্রতিশ্রুতি দিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী

শিক্ষার সর্বস্তরে অস্বাভাবিক ফি বৃদ্ধি, ক্যাপিটেশন ফি, শিক্ষার বেসরকারীকরণ, বাণিজ্যিকীকরণ ও সাম্প্রদায়িকীকরণের প্রতিবাদে এবং ধর্মনিরপেক্ষ, বৈজ্ঞানিক ও গণতান্ত্রিক শিক্ষা এবং প্রতিটি ছাত্রের শিক্ষার অবাধ সুযোগের দাবিতে অল ইন্ডিয়া ডি এস ও'র আহ্বানে ২৪ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে এক ঐতিহাসিক ছাত্র-বিক্ষোভ ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। প্রধানত উত্তর ও মধ্য ভারতের রাজ্যগুলি যথা পাঞ্জাব, চন্ডীগড়, হরিয়ানা, দিল্লি, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, ছত্তিশগড় ও বিহার থেকে দশ হাজারেরও বেশি ছাত্রছাত্রী এই বিক্ষোভে সামিল হয়। অল ইন্ডিয়া ডি এস ও'র ৫০ বৎসর পূর্তিতে সংগঠনের সংগ্রামী ঐতিহ্যকে বহন করে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির শিক্ষাক্ষেত্রে জনবিরোধী নীতিসমূহের বিরুদ্ধে স্তরে স্তরে জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মাস ধরে আন্দোলন গড়ে তুলে সেই ধারাবাহিকতাতেই

ছয়ের পাতায় দেখুন

২৪ সেপ্টেম্বর দিল্লির মিন্টো ব্রিজ পার হয়ে সংসদ অভিমুখে ছাত্রমিছিল

মেডিক্যালে ছাত্র আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য জয়

কোর্টের রায়ে ক্যাপিটেশন ফি নিয়ে ভর্তি বাতিল

মেধা যাচাইয়ের পরীক্ষা এড়িয়ে সওয়া নয় লক্ষ টাকা ক্যাপিটেশন ফি নিয়ে, অনাবাসী ভারতীয় এবং ম্যানেজমেন্ট কোটায় ১০৫ জনকে রাজ্য সরকার ডাক্তারি কোর্সে ভর্তি করে নিয়েছিল। রাজ্য সরকারের এই অন্যায় সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে এ আই ডি এস ও ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের সংগঠিত করে দফায় দফায় আন্দোলন গড়ে তোলে, আদালত পর্যন্ত আন্দোলনকে নিয়ে যায়। ২৯ সেপ্টেম্বর হাইকোর্টের রায়ে রাজ্য সরকারের ভর্তির সিদ্ধান্ত নাকচ হয়ে গিয়েছে। হাইকোর্ট অবিলম্বে ক্যাপিটেশন ফি ফেরত দেবার নির্দেশ দিয়েছে। ছাত্র আন্দোলনের এই উল্লেখযোগ্য জয়ে বিব্রত সিপিএম ফ্রন্ট সরকার তাদের বৈষম্যমূলক ও অন্যায় সিদ্ধান্ত বহাল রাখার সমর্থন আদায় করতে সুপ্রিম কোর্টে দৌড়েছে।

গত বছর রাজ্য সরকার মেডিকেল শিক্ষায় বেতন ও হোস্টেল চার্জ বিপুলভাবে বাড়াবার চেষ্টা করায় এ আই ডি এস ও রাজ্যব্যাপী আন্দোলন শুরু করে। আন্দোলনের চাপে রাজ্য সরকার বর্ধিত

ছয়ের পাতায় দেখুন

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদে এস ইউ সি আই-এর ৬ অক্টোবরের মহামিছিল প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য বাতিল করা হয়।

চাল চুরির প্রতিবাদ করায় সি পি এমের বর্বর হামলা

১২ ঘন্টার রায়দীঘি বন্‌ধ

লক্ষ লক্ষ টাকার চাল চুরি, চুরির অপরাধ ঢাকতে সি পি এমের নির্লজ্জ অপচেষ্টা, প্রতিবাদী মানুষদের উপর এবং বিডিও-র উপস্থিতিতে এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনারত এস ইউ সি আই নেতাদের উপর সি পি এম দুষ্কৃতীদের নৃশংস হামলার প্রতিবাদে এস ইউ সি আইয়ের ডাকে ১ অক্টোবর ১২ ঘণ্টা রায়দীঘি বন্‌ধ অভূতপূর্ব-ভাবে সফল হয়েছে। বন্‌ধের দিন নদীবহুল রায়দীঘি থানার খেয়াঘাট নিস্তরঙ্গ ছিল; ভুটভুটি চলেনি। বেশিরভাগ স্কুল-কলেজ, হাটবাজার বন্ধ ছিল। সবরকম চেষ্টা ও ত্রাস সৃষ্টি করেও সিপিএম বন্‌ধ ভাঙতে পারেনি। বিকৃত বামপন্থা যে কতদূর অমানবিক ও কতটা কুৎসিত হতে পারে তার নিদর্শন হয়ে রইল দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার রায়দীঘি ব্লকে সি পি এমের তাণ্ডব।

এলাকার বিধায়ক সি পি এম মন্ত্রী কান্তি গাঙ্গুলি, পঞ্চায়েত সমিতিও সি পি এম দখল করেছে। ফলে এলাকায় সি পি এমের একাধিপত্য। তা সত্ত্বেও মাসের পর মাস মিড-ডে মিল, এবং বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের চাল অমিল।

দীর্ঘদিন ধরে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে চাল দেওয়া হচ্ছে না। ব্লকের রিলিফ অফিসাররা ডিলারদের হাতে সরকারি আদেশনামা দিলেও ডিলাররা খাঁড়াপাড়া সমবায় গোডাউনে চাল আনতে গিয়ে বারে বারে ফিরে এসেছেন। শাসকদলের প্রতিনিধিরা এবং তাদের অনুগত অফিসাররা জানতেন চাল আসা সত্ত্বেও কেন সরবরাহ হচ্ছে না। খাঁড়াপাড়া সমবায় সমিতির পরিচালক হলেন সি পি এমের আঞ্চলিক শীর্ষস্থানীয় কিছু নেতা ও বর্তমানে সি পি এম আশ্রিত কিছু কংগ্রেস নেতা। জানা গিয়েছে কেন্দ্রীয় বিভিন্ন প্রকল্পের চাল সহ শিশুদের জন্য সরবরাহ করা চাল চুরি করে বাজারে চড়া দামে বিক্রি হয়েছে। আত্মসাৎ করা চালের মূল্য চল্লিশ লক্ষ টাকা। এর বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই রায়দীঘি, কঙ্কনদীঘি এবং কাশিনগর এই তিনটি আঞ্চলিক কমিটি মিলিতভাবে আন্দোলনে নেমেছে। এস ইউ সি আই-এর আন্দোলনের চাপে বিডিও গোডাউন সিল করে দেন। এরপর ৪৪২৮ কুইন্টাল চাল চুরির ঘটনা আড়াল করার জন্য মাত্র দু-লরি চাল তারা নিয়ে আসে এবং স্কুলগুলিতে পচা, গুমো, অখাদ্য কিছু চাল পাঠায়।

লরির চাল আটক করা, অপরাধীদের শাস্তি এবং স্কুলে খাওয়ার যোগ্য চাল সরবরাহের দাবিতে ২৭ সেপ্টেম্বর মথুরাপুর ২নং ব্লকে এস ইউ সি আইয়ের ডাকে বিক্ষোভ প্রদর্শন ও ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন এস ইউ সি আই দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির সদস্য কমরেড সনাতন দাস, কঙ্কনদীঘি আঞ্চলিক সম্পাদক কমরেড উত্তম হালদার ও অঞ্চলপ্রধান বিশাখা মণ্ডল, রায়দীঘি পঞ্চায়েতের সদস্য জয়দেব সর্দার ও এলাকার বিশিষ্ট সংগঠক বিজয় হালদার।

ডেপুটেশনের নেতৃবৃন্দ যখন দোতলায় বিডিও-র সঙ্গে আলোচনা করছিলেন, তখনই বিডিও অফিসের সামনে শান্তিপূর্ণ অবস্থানকারীদের উপর সি পি এমের কয়েকজন ব্লক ও আঞ্চলিক নেতা সহ প্রায় ৪০/৪৫ জন লাঠিসোঁটা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী জনগণের মুখ বন্ধ করাই ছিল তাদের লক্ষ্য। বৃদ্ধ ও মহিলাদেরও তারা রেহাই দেয়নি। ষাট বছরের বৃদ্ধ কুমড়াপাড়ার শিবচরণ মণ্ডলের বুকে পা দিয়ে তারা গলা টিপে মারার চেষ্টা করে। ছাত্র কর্মী বাবলু মণ্ডলকে প্রচণ্ড মেরে ড্রেনে ফেলে দেয় এবং মরে গিয়েছে ভেবে উল্লাস করতে থাকে। গিলারছাটের অমরেন্দ্র মণ্ডল, পূর্ব জটার চটিরাম মণ্ডল, কঙ্কনদীঘির উত্তম পাল ও পার্টির জেলা কমিটির সদস্য সনাতন দাস সহ অন্যান্যদের তারা প্রচণ্ড মারধোর করে। আক্রমণকারীরা এক মহিলার শাড়ি খুলে নিয়ে অট্টহাস্য করতে থাকে। মহিলারা দুর্বৃত্তদের পা চেপে ধরলে তারা তাদের মুখে লাথি মারে, ব্লাউজ ছিঁড়ে দেয় এবং 'বানতলা ধানতলা করে দাও' বলে বীভৎস উল্লাস করতে থাকে। মহিলাদের আতঙ্কে কাঁদতে দেখে আক্রমণকারীরা হাসিতে ফেটে পড়ে। তাদের আক্রমণে পারমিতা দাস, অচলা সরদার, শান্তি কয়াল সহ পাঁচজন মহিলা গুরুতর আহত হন।

সমস্ত ঘটনা ঘটে বিডিও-র সামনে। ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে রায়দীঘি থানার পুলিশ সমস্ত দেখেও না দেখার ভান করে। ঘটনার দু-ঘণ্টা পর পুলিশ আসে এবং এসেই আক্রান্ত ও আহত এস ইউ সি আই নেতা ও কর্মীদের গ্রেপ্তার করে এবং বলে, আহত সিপিএম কর্মীদের অভিযোগের ভিত্তিতেই তাদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে।

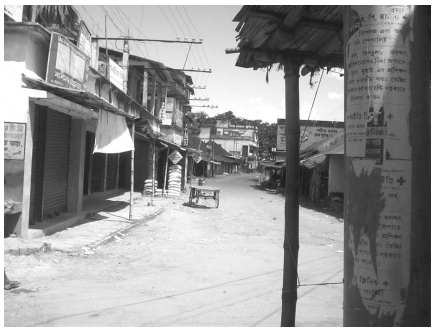

বন্‌ধের দিন রায়দীঘির একটি ব্যস্ত এলাকা

সি পি এমের এই নৃশংস আক্রমণ ও অপরাধীদের পক্ষ নিয়ে পুলিশ-প্রশাসনের এই নির্লজ্জ ভূমিকায় জনমনে প্রবল ক্ষোভ দেখা দেয়। সেই ক্ষোভকে সংগঠিত রূপ দিয়ে চাল চোরদের গ্রেপ্তার, গরিবদের জন্য খাওয়ার যোগ্য চাল সরবরাহের দাবিতে ১ অক্টোবর ১২ ঘণ্টা রায়দীঘি বন্‌ধ-এর ডাক দেয় এস ইউ সি আই। বন্‌ধ ভাঙতে সিপিএম সর্বশক্তি নিয়োগ করে। জবরদস্তি দোকান খোলানো, গাড়ি ও ভুটভুটি চালানোর চেষ্টা তারা চালায়। তারা বলে আজ যারা দোকান, গাড়ি, নৌকা চালানো বন্ধ রাখবে, চিরদিনের মতো তাদের রুজিরোজগার বন্ধ হবে। কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়। বিক্ষুব্ধ জনগণ তাদের সাথী প্রতিবাদী এস ইউ সি আইয়ের পাশে দাঁড়িয়ে বন্‌ধ সফল করেন। দলের পক্ষ থেকে দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালানোর এবং সেজন্য এলাকায় দলমত নির্বিশেষে গণকমিটি গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়েছে।

কুলতলিতে মিড-ডে মিলের চাল চুরির প্রতিবাদ

কুলতলি ব্লকের স্কুলগুলিতে মিড ডে মিলের চাল লোপাট ও এস জি আর ওয়াই প্রকল্পের লক্ষ লক্ষ টাকা তছরুপের প্রতিবাদে গত ১ অক্টোবর ডি এস ও, ডি ওয়াই ও এবং এম এস এসের পক্ষ থেকে কুলতলি বিডিও-কে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ডেপুটেশনে অভিযোগ করা হয় যে, একদিকে যেমন স্কুলগুলিতে দীর্ঘ দিন মিড-ডে মিলের চাল দেওয়া হয়নি, তেমনি এস জি আর ওয়াই প্রকল্পের কাজ শুধু খাতায় কলমে সারা হয়েছে, বাস্তবে কাজ কিছুই হয়নি। সাতদিনের মধ্যে অভিযোগের যথাযথ তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়া হলে বিডিও-কে ঘেরাও করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন ডি এস ও রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড গোষ্ঠ ভুঁঞ্যা।

মেদিনীপুর

বিদ্যুৎ বিল অগ্রিম আদায়ের প্রতিবাদে বিক্ষোভ

এত দিন কৃষি বিদ্যুৎগ্রাহকদের মিটার ছিল না, বছরের বিল ১২টি কিস্তিতে ১২ মাসে জমা দিতে হত। এমনিতেই ক্রমাগত বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি করায় চাষীরা সংকটে রয়েছে, তার ওপর হঠাৎ বিদ্যুৎ পর্ষদ সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের টাকা ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে জমা দেওয়ার জন্য বিল পাঠিয়েছে। এই অন্যায় ও অযৌক্তিক বিদ্যুৎ বিল আদায়ের প্রতিবাদে ২৮ সেপ্টেম্বর সারা বাংলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতি (অ্যাবেকা)র মেদিনীপুর জেলা সম্পাদক মধুসূদন মান্নার নেতৃত্বে পুলিন মাইতি, অশোকতরু প্রধান, বিশ্বরূপ অধিকারীকে নিয়ে এক প্রতিনিধিদল বিদ্যুৎ দপ্তরের এই তুঘলকী নীতির তীব্র সমালোচনা করেন।

একই দাবিতে কোলাঘাট আঞ্চলিক বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতির সভাপতি জয়মোহন পালের নেতৃত্বে শঙ্কর মালাকার সহ এক প্রতিনিধি দল বিদ্যুৎ দপ্তরের স্টেশন ম্যানেজারের কাছে ডেপুটেশন দেন। বালিচক স্টেশন ম্যানেজার ও মেদিনীপুর সার্কেল ম্যানেজারের কাছেও দাবিগুলি নিয়ে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ডেপুটেশন দু'টিতে নেতৃত্ব দেন সমিতির সভাপতি নারায়ণচন্দ্র দাস, অফিস সম্পাদক অমল মাইতি প্রমুখ।

কলকাতা

অনলাইন লটারি বন্ধের দাবিতে বরানগর থানায় ডেপুটেশন

ডি ওয়াই ও, ডি এস ও এবং এম এস এস-এর বরানগর শাখার উদ্যোগে এলাকায় অনলাইন লটারির নামে সরকারি মদতে জুয়া খেলা বন্ধ, মদের ঢালাও লাইসেন্স দেওয়ার সিদ্ধান্ত বাতিল, সমগ্র বরানগর জুড়ে পাড়ায় পাড়ায় যে চোলাই মদের ঘাঁটি চলছে তা বন্ধের দাবিতে ২৬ সেপ্টেম্বর বরানগর থানায় ডেপুটেশন দেওয়া হয়। প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি দলের বক্তব্যের যৌক্তিকতা স্বীকার করা হয় এবং সাথে সাথে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। ডেপুটেশনে প্রতিনিধিত্ব করেন কমরেডস মঞ্জু চক্রবর্তী, নিবেদিতা ব্যানার্জী, শ্যামলী কর, কৃষ্ণা দে, দিলীপ দাস ও সুপ্রিয় ভট্টাচার্য।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বরানগর থানার বিপরীতে ঘোষপাড়া এলাকার মধ্যে সরকারের পক্ষ থেকে একটি আইসক্রিমের দোকানকে 'বার' করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে যার বিরুদ্ধে ডি ওয়াই ও প্রতিবাদ জানিয়েছে।

উত্তর ২৪ পরগণা

গাইঘাটায় বন্যাদুর্গত চাষীদের বিদ্যুৎদপ্তর ঘেরাও

চাষীদের মোটরচালিত শ্যালো টিউবওয়েলের ক্ষেত্রে বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধির প্রতিবাদে এবং বন্যা কবলিত এলাকায় এই বিল মকুব করার দাবিতে ২৭ সেপ্টেম্বর বন্যাদুর্গত প্রায় দেড়শো চাষী গাইঘাটা গ্রুপ সাপ্লাই অফিসের স্টেশন ম্যানেজারকে সাড়ে তিন ঘণ্টা ঘেরাও করে রাখেন।

২৭ সেপ্টেম্বর বন্যাদুর্গত চাষীদের বিক্ষোভ

তিনি বিল দেওয়ার মেয়াদ ১৪ দিন বাড়িয়ে দিয়েও বিক্ষোভকারীদের শান্ত করতে পারেননি। শেষে বারাকপুর এস ই'র অফিসে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত জানানো হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হলে বিক্ষোভ প্রত্যাহৃত হয়। এদিনের বিক্ষোভে সামিল হয় — সারা বাংলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতি এবং অগভীর নলকূপ কৃষক সমিতি। এই দুই সংগঠনের সম্পাদক স্বপন গোস্বামী এবং সভাপতি দেবদাস বৈদ্য বলেন, দেশের ছ'টি রাজ্যে চাষের ক্ষেত্রে বিনা পয়সায় বিদ্যুৎ দেওয়া হয়। আর আমাদের রাজ্য সরকার উত্তরোত্তর তা বাড়িয়ে চলেছে। জেলার বিস্তীর্ণ এলাকার চাষীরা জলে ডুবে সর্বস্বান্ত হয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে আগাম বিদ্যুৎ-এর বিল জমা দেওয়ার জন্য বিল ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এইসব মোটরের ক্ষেত্রে কোনও মিটার নেই। আগে মাসে মাসে বিল দিতে হত। এখন তিন মাসের বিল এক সঙ্গে আগাম দিতে বলা হচ্ছে। এই মাশুল বেশ খানিকটা বাড়িয়েও দেওয়া হয়েছে। সমস্যার সমাধান না হওয়ায় পূর্ব ঘোষণা মতো ১ অক্টোবর তিন শতাধিক কৃষক সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত বিদ্যুৎ দপ্তর ঘেরা করেন।

হাবড়ায় ডি-ই অফিস ঘেরাও

গত ২৮ সেপ্টেম্বর উত্তর ২৪ পরগণার হাবড়াতে দুই শতাধিক কৃষক তাদের অগ্রিম এককালীন তিন মাসের বিদ্যুৎ বিল প্রত্যাহার, কৃষিতে বিনাপয়সায় বিদ্যুৎ এবং গ্রাহকদের মিটার দেওয়ার দাবিতে ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার (ডি-ই)কে ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায় এবং স্মারকলিপি দেয়। এই ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন সারা বাংলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতির উত্তর ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদক অনুকূল ভদ্র।

সিপিএম নেতৃত্বের কাছে এখন হারাধন রায়ের মত শ্রমিক নেতারা বাসি, অচল

রানিগঞ্জ-আসানসোল শিল্পাঞ্চলের একদা সিপিআই(এম) দলের প্রবীণ শ্রমিক নেতা হারাধন রায় এখন নিজের দলেই প্রায় অচ্ছ্যুৎ। কোলিয়ারি শ্রমিক ইউনিয়নের সম্পাদকের পদ থেকে তাঁকে আগেই সরানো হয়েছিল। তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের আবাসস্থল রানিগঞ্জ পার্টি অফিস 'কয়লা ভবন'ও ছাড়তে বাধ্য হলেন তিনি। বিস্তীর্ণ কোলিয়ারি অঞ্চলে শ্রমিকদের মধ্যে সংগঠন গড়ে তোলার মত এই ভবনটি তৈরির পেছনেও তাঁর অবদান কম ছিল না।

হারাধনবাবু বামপন্থী আন্দোলন তথা সিপিআই দলের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন পাঁচের দশকের গোড়ার দিকে। তারপর কয়েক দশক ধরে কোলিয়ারি অঞ্চলে শ্রমিকদের সুখ-দুঃখের সাথী হয়ে তাদের নানা দাবি নিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলেছেন ও নেতৃত্ব দিয়েছেন। ছ'বার বিধায়ক ও তিনবার সাংসদ হিসাবে তিনি নির্বাচিত হয়েছেন। পার্টি অফিস ছাড়া তাঁর থাকার ব্যক্তিগত আলাদা কোন জায়গাও ছিল না। তাঁকেই আজ নিঃশব্দে চলে যেতে হল। কেন তাঁকে অপসারণ করা হল বা কেন তাঁকে অফিস ছাড়তে হল, আজ পর্যন্ত তার কোন বাখ্যাই সিপিএম নেতৃত্ব জনসমক্ষে দেয়নি। সকলেই জানেন যে, দীর্ঘ বছর ধরে গোটা কোলিয়ারি এলাকা জুড়ে মাফিয়ারাজ কায়েম হয়েছে। বেআইনিভাবে কয়লা তোলা, কয়লা পাচার ইত্যাদি নানা অসামাজিক কার্যকলাপকে মদত দিয়ে চলেছে শাসক দলের স্থানীয় নেতারা। শ্রমিকদের স্বার্থ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে লড়াই করা হারাধনবাবু মানতে পারেন নি নেতাদের এইসব কার্যকলাপ। তিনি সাধ্যমত এ ব্যাপারে বাধা দেবার চেষ্টা করেছেন। ফলে তার সাথে বিরোধ বেধেছে পার্টি নেতৃত্বের। দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা এই বিরোধ আজ প্রকাশ্যেও এসে গেছে অনেকখানি। পাশাপাশি কোলিয়ারি শিল্পের বেসরকারীকরণের যে নীতিকে সিপিএম আজ প্রকাশ্যে সমর্থন জানাচ্ছে, সেক্ষেত্রেও হারাধনবাবু একটি বাধা হিসাবে দাঁড়িয়েছিলেন। তাই, পার্টি নেতৃত্ব চাইছিল, সংগঠন থেকে তিনি নিজেই ধীরে ধীরে সরে যান, নিষ্ক্রিয় হয়ে যান এবং তাঁর অস্তিত্ব মুছে যাক। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়েছিল, যাতে তিনি শেষপর্যন্ত পার্টি অফিস তথা সংগঠন ছাড়তে বাধ্য হলেন।

পার্টি তিন দশক ক্ষমতায় থেকে শ্রমিকস্বার্থ বিসর্জন দিয়ে একনিষ্ঠভাবে মালিকশ্রেণীর সেবা করে যাচ্ছে। ফলে হারাধনবাবুদের মতো সৎ, শ্রমিক আন্দোলনে আপসহীন সংগ্রামী মানুষদের আজ আর পার্টির প্রয়োজন নেই। হারাধনবাবুদের মত বহু কর্মীর ত্যাগ, সততা ও সংগ্রামকে কাজে লাগিয়েই সংসদীয় রাজনীতিতে পার্টি ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে। এখন ক্ষমতায় টিকে থাকতে হলে তাদের প্রয়োজন এমন সমস্ত ব্যক্তিদেরই যারা নানা অবৈধ উপায়ে দলকে নির্বাচনে জেতাতে পারবে, অত্যাচার চালিয়ে, খুন করে বিরোধী কণ্ঠকে রোধ করতে পারবে। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পরই সিপিএম-এর সোস্যাল ডেমোক্রেটিক চরিত্র প্রকাশ্যে এসে গেছে। চরম সংকটগ্রস্ত পুঁজিবাদকে বাঁচাবার পবিত্র দায়িত্ব তারা কাঁধে তুলে নিয়েছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে তাদের ক্ষমতা ও মন্ত্রীত্বের উদগ্র লালসা। এই ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য অন্যান্য বুর্জোয়া দলের মতই তারাও আজ জনগণের সমর্থনের উপর নির্ভর করছে না, নির্ভর করছে মালিকশ্রেণীর টাকার ওপর, আর নির্ভর করছে সমাজের কুখ্যাত সমাজবিরোধীদের ওপর। তাই বুন্টন - তারকেশ্বর লোহার - পলাশ-দিলীপদের দলে এত কদর। হারধনবাবুরা পার্টি নেতৃত্বের চোখে আজ বাসি, অচল।

হারাধনবাবুদের মতো আরও বহু আদর্শবান কর্মী, যাঁরা আজও সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্ন বুকে বহন করেন, মানুষের শোষণ-নিপীড়ন আজও যাঁদের বিচলিত করে, যাঁরা মনে করেন শোষণমূলক পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার উচ্ছেদ ছাড়া শোষিত মানুষের মুক্তি সম্ভব নয়, তাঁরা নেতৃত্বের এই আপসকামিতা মেনে নিতে পারেন নি। এঁদের বেশিরভাগই গভীর ব্যথায়, দুঃখে হতাশাগ্রস্ত হয়ে নীরবে সরে গেছেন দল থেকে। বাকিদের বহিষ্কার করা হয়েছে। কিন্তু কেন এমন হল? কেন বহু কর্মীর এত আত্মত্যাগ, এত সংগ্রাম সত্ত্বেও তাদের সমস্ত স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে গেল? কেন হারাধনবাবুদের মত সৎ ও সংগ্রামী কর্মীদের আজ দলে আর স্থান নেই?

বাস্তবে নামে কমিউনিস্ট পার্টি হলেও, পার্টির রাজনৈতিক লাইন যদি সঠিক না হয়, নীতি যদি সঠিক না হয়, নেতৃত্ব যদি আপসকামী হয়, তবে কর্মীদের যত সততাই থাকুক, যত আত্মদানই থাককু, তা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

আমাদের দেশে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে সহস্র প্রাণের আত্মদান সত্ত্বেও সেদিন যে জাতীয়তাবাদী নেতারা স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছেন, তাদের আপসকামীতার জন্য স্বাধীনতার সমস্ত ফল এদেশের মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিশ্রেণীর কুক্ষিগত হয়েছে। শ্রমিক-কৃষক-সাধারণ মানুষ শোষণের যাঁতাকলে আজও সমানভাবে পিষ্ট হয়ে চলেছে।

একদিন রুশ বিপ্লব, চীন বিপ্লব, ভিয়েতনামের লড়াই এদেশের মানুষকে বামপন্থী আদর্শে উদ্বুদ্ধ করেছিল। পাঁচের দশক, ছয়ের দশকের বামপন্থী আন্দোলনের প্রতি সাধারণ মানুষের প্রবল আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছিল। নেতাদের জ্বালাময়ী বক্তৃতা আর পতাকার লাল রঙ দেখে সেদিন দলে দলে মানুষ কমিউনিস্ট নামধারী দলটির সাথে যুক্ত হয়েছিল। এই দীর্ঘ বামপন্থী আন্দোলনের সমস্ত কৃতিত্বকে আত্মসাৎ করেই সিপিএম নেতৃত্বাধীন ফ্রন্ট সরকার 'সংগ্রামের হাতিয়ার' নাম নিয়ে ক্ষমতাসীন হয়। ক্ষমতায় যাওয়ার আগে বিভিন্ন আন্দোলনে শোষণের বিরুদ্ধে গরম গরম স্লোগান থাকলেও, এমনকী কখনও কখনও তা মারমুখী হয়ে উঠলেও, নেতৃত্বকারী দল হিসাবে সিপিএমের আসল লক্ষ্য ছিল আন্দোলনে মানুষের আত্মত্যাগকে পুঁজি করে নির্বাচনে আসন বাড়ানো এবং শেষপর্যন্ত সরকারি গদি দখল করা। নিচুতলার কর্মীরা সেদিন নেতাদের মুখে আন্দোলনের কথা, বিপ্লবের কথা, শ্রেণী সংগ্রামের কথা শুনে এই দলটিকেই যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টি বলেই ভেবেছিল। '৬৪ সালে ডাঙ্গে নেতৃত্বের বিরুদ্ধে আপসকামীতার অভিযোগ এনে সিপিআই ভেঙে সিপিএম তৈরি হয়েছিল। তারা ঘোষণা করেছিল, সিপিআই নয়, সিপিআই(এম)ই বিপ্লব করবে। নেতাদের এই বিপ্লবী বুকনীতে বিশ্বাস রেখেই নিচুতলার সৎ, আদর্শবান, সংগ্রামী বামপন্থী সংগঠক কর্মীরা নিষ্ঠার সাথে কাজ করে গেছে। নেতাদের বক্তব্যের সত্যতা, দলের নীতি, লাইন কোন কিছুই যাচাই করার তাঁরা প্রয়োজনই অনুভব করেনি। সিপিআই, সিপিএম যে আদৌ কমিউনিস্ট পার্টি হিসাবে মার্কসবাদী চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে গড়েই উঠতে পারেনি — এ বিচারও তারা করতে পারে নি। প্রায় তিন দশক সরকারে থাকার সুবাদে আজ যখন এই দলগুলিই অন্যান্য বুর্জোয়া দলগুলির মতোই যথেচ্ছ মূল্যবৃদ্ধি ঘটাচ্ছে, বেপরোয়া কর বসাচ্ছে, রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের বেসরকারীকরণের পক্ষে সওয়াল করছে, একদিন দলের যে নেতারা দেশিয় একচেটে পুঁজি ও বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে হুংকার দিয়েছেন, আজ তাঁরাই যখন উন্নয়নের ঢাক পিটিয়ে দেশি-বিদেশি পুঁজির দাক্ষিণ্য করজোড়ে প্রার্থনা করছেন, মালিকের শত শোষণ ও আক্রমণ সত্ত্বেও, পরিবর্তিত পরিস্থিতির দোহাই পেড়ে — 'জঙ্গি শ্রমিক আন্দোলন চলবে না' বলে ফতোয়া দিচ্ছেন এবং শ্রমিক আন্দোলন গলা টিপে মারছেন, তখন স্বভাবতই দলের পুরনো সংগ্রামী মানুষজনের পক্ষে তা মেনে নেওয়া কঠিন হচ্ছে, এতদিনের চেতনা ও বিবেক প্রবল ধাক্কা দিচ্ছে। পার্টির এই পরিবর্তিত রূপের সাথে যারা মানিয়ে নিচ্ছে, বা এরই ভিত্তিতে যারা পার্টিতে আসছে তারাই এখন দলের সম্পদ, তারাই এখন করে-কম্মে খাচ্ছে। আর, যাঁরা মানতে পারছে না, পার্টির চোখে তাঁরা আজ ব্যাকডেটেড, অচল। আবার এঁদের সততা, নিষ্ঠা ও সংগ্রামের সাথে জনগণ ও নিচুতলার কর্মীরা যথেষ্ট পরিচিত বলেই নেতৃত্বের পক্ষে এঁদের বিরুদ্ধে যা হোক কিছু অপবাদ দেওয়া মুসকিল হচ্ছে, প্রকাশ্যে নিন্দা করা যাচ্ছে না। তাই পার্টি নেতৃত্ব এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি করে দিচ্ছে, যাতে এঁদের নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া যায়, তাঁরা নিজেরাই দল ছেড়ে যেতে বাধ্য হন। হারাধনবাবুর ক্ষেত্রে ঠিক এই জিনিসই ঘটেছে। অনেকেরই স্মরণে আছে, এই জেলারই অপর একজন নেতা, পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, প্রয়াত বিনয় চৌধুরী একসময় রাজ্য সরকারকে এই বলে চিহ্নিত করেছিলেন যে, এই সরকার 'অফ দ্য কন্ট্রাক্টর, বাই দ্য কন্ট্রাক্টর, ফর দ্য কন্ট্রাক্টর' অর্থাৎ জনগণের নয়, ঠিকাদারদের সরকার। সকলেই জানেন, একথা বলার অপরাধে কীভাবে বিনয়বাবুকে নিঃশব্দে সংগঠন থেকে লোকচক্ষুর অন্তরালে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

এমতাবস্থায়, যাঁরা আজও শাসকদলের সাথে রয়েছেন, শোষিত মানুষের স্বার্থে শ্রমিক আন্দোলন-গণআন্দোলনকে শক্তিশালী করার কথা ভাবছেন, আবার নেতৃত্বের দ্বিচারিতায়, আপসকামীতায় ব্যথিত হচ্ছেন, নেতৃত্বের মুখে পরিবর্তিত পরিস্থিতির তত্ত্ব শুনে বিভ্রান্ত হচ্ছেন — তাঁদের কাছে হারাধন রায়ের ট্র্যাজেডি এক দৃষ্টান্তস্বরূপ। একথা বোধহয় আজ তাদের বোঝা দরকার যে, সৎ-সংগ্রামী মানুষের স্থান আজ আর শাসক বামপন্থী পার্টিগুলির মধ্যে নেই। সততা-সংগ্রাম আজ শাসক পার্টিগুলির উচ্চাকাঙ্খা পূরণে বাধা। যত দিন যাচ্ছে ততই এগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠছে এবং হারাধনবাবুদের মত সংগ্রামী মানুষরা দল ছাড়তে বাধ্য হচ্ছেন।

মজদুর বাঁচাও কমিটির উদ্যোগে

বরাকরে শ্রমিক সম্মেলন

বর্ধমান জেলার সালামপুর, বরাকর, নিরসা অঞ্চলের শ্রমিক প্রতিনিধিদের নিয়ে শ্রমিক বাঁচাও কমিটির উদ্যোগে দ্বিতীয় শ্রমিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল ২৬ সেপ্টেম্বর বরাকরের লখিয়াবাদে। ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিঃ, ভারত কোকিং কোল লিঃ, ডিভিসি-মাইথন, ইমপেক্স কেরোটেক লিঃ, বালাজী গ্লাস ওয়ার্কস লিঃ সহ এলাকার বিভিন্ন কলকারখানায়, কয়লাখনি এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মরত দেড়লক্ষাধিক শ্রমিকদের প্রতিনিধিরা এই সম্মেলনে অংশ নেন।

সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন বিসিসিএল বেগুনিয়া কোলিয়ারির শ্রমিক নেতা কমরেড সাধু কোড়া। সম্মেলন উদ্বোধন করেন ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর রাজ্য সহসভাপতি কমরেড এ এল গুপ্তা। এই সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড গোপাল কুণ্ডু।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কংগ্রেস ও বিজেপি সরকারের পথ ধরে পশ্চিমবঙ্গের সিপিএম ফ্রন্ট সরকারও নয়া উদারনীতি রূপায়ণ করার ফলে এই অঞ্চলের সর্বস্তরের শ্রমজীবী মানুষ আজ এক মারাত্মক বিপর্যয়ের সম্মুখীন। ইতিমধ্যেই ইস্কো-কুলটি ও সেন র‍্যালে কারখানা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে; সিপিএম ফ্রন্ট সরকার ও ঝাড়খণ্ডের বিজেপি সরকারের প্রত্যক্ষ মদতে ইস্টার্ন কোলফিল্ডস্ লিঃ ও ভারত কোকিং কোল লিমিটেডে আউট সোর্সিং-এর নামে কয়লাশিল্পে বেসরকারীকরণ শুরু হয়ে গিয়েছে এবং ইসিএল, বিসিসিএল, ইস্কো, বার্ন স্ট্যান্ডার্ড, হিন্দুস্তান কেবলস্ সমেত সমস্ত সরকারি শিল্পেই ভিআরএসের মাধ্যমে ব্যাপক ছাঁটাই হয়েছে।

অপরদিকে, এই উদার আর্থিক নীতির জমানায় এসব অঞ্চলের প্রাইভেট কলকারখানার শ্রমিকরা সীমাহীন মালিকী শোষণের শিকার। যখন তখন শ্রমিক ছাঁটাই এখানকার নিত্যদিনের ঘটনা। এগুলিতে দৈনিক মজুরি ৩০ থেকে ৪৫ টাকা, যা সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরির থেকেও অনেক কম। আইন মোতাবেক পিএফ, ইএসআই বা মেডিক্যালের কোন ব্যবস্থাই নাই। এক কথায়, মালিকরা দেশের প্রচলিত শ্রম আইনগুলি মানেই না।

এমতাবস্থায় যখন সরকারি ও মালিকী আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগঠিত ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার পরিবর্তে সিপিএম ও কংগ্রেস মালিকদের পক্ষ নিয়ে শ্রমিক আন্দোলনকে ধ্বংস করার চেষ্টা চালাচ্ছে, তখন ইউ টি ইউ সি (লেনিন সরণী)'র আদর্শে অনুপ্রাণিত মজদুর বাঁচাও কমিটির নেতৃত্বে কলকারখানায় খাদানে শ্রমিকরা সংগঠিত হচ্ছেন এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন। আন্দোলনের এই ধারাবাহিকতাতেই অনুষ্ঠিত হল দ্বিতীয় শ্রমিক সম্মেলন। সম্মেলন বানচাল করে দেওয়ার জন্য সিপিএম ও কংগ্রেসের পক্ষ থেকে খুদিকা, কালিপাথর সহ কয়লা খনি অঞ্চলের বিভিন্ন মহল্লা ধাওড়াতে ব্যাপক সন্ত্রাস সৃষ্টি করা সত্ত্বেও সম্মেলন সফল হয়েছে। উদ্বোধক কমরেড এ এল গুপ্তা সমস্ত ভয়ভীতি উপেক্ষা করে আগামী দিনে সংগঠিত দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য উপস্থিত প্রতিনিধিদের কাছে আবেদন জানান।

সম্মেলনে সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ করেন মজদুর বাঁচাও কমিটির সভাপতি কমরেড অমর চৌধুরী, রিপোর্টের উপর আলোচনায় অংশ নেন কমরেডস্ অরুণ গরাই, রতন হাঁসদা, হীরু তন্তুবায়, শঙ্কর সিং, মুকুল সিং, রাজেন্দর পাশী সহ ২৬ জন প্রতিনিধি।

প্রধান অতিথির ভাষণে কমরেড গোপাল কুণ্ডু বলেন, পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার উচ্ছেদ ছাড়া শ্রমিক জীবনের মূল সমস্যাগুলির সমাধান সম্ভব নয়। তাই শ্রমিকদের একদিকে মালিকী ও সরকারি আক্রমণের বিরুদ্ধে ট্রেড ইউনিয়ন লড়াই করতে হবে, অন্যদিকে পুঁজিবাদী শোষণ থেকে মুক্তির সঠিক রাজনীতি কোন্‌টা, সেটাও গভীরভাবে বুঝতে হবে এবং ভোটসর্বস্ব রাজনীতির প্রভাব থেকে নিজেদের মুক্ত করতে হবে।

সম্মেলনে কমরেড অমর চৌধুরীকে সভাপতি ও পরেশ কোড়াকে সাধারণ সম্পাদক করে মোট ২৫ জনের কার্যকরী সমিতি নির্বাচন করা হয়। কয়লা শিল্পে বেসরকারীকরণের প্রতিবাদে এবং কয়লা শ্রমিকদের জন্য নতুন বেতনচুক্তি, কয়লা আমদানির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি, সমস্ত শিল্প-শ্রমিক ও অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা, সারা বছর কাজ পাওয়ার আইনি স্বীকৃতি, অসংগঠিত শ্রমিকদের পি এফ, পেনশন ও চিকিৎসা ভাতার দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সম্মেলনে।

যোজনা কমিশনে বিদেশি উপদেষ্টা

সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির ভজনা করে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা যায় না

১০ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজকর্ম কতটা হয়েছে কিংবা কী কী করা দরকার তা খতিয়ে দেখার জন্য কেন্দ্রীয় যোজনা কমিশন এবার একাধিক পরামর্শদাতা কমিটি গঠন করেছিল।

ইতিপূর্বে কোন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্বর্তী পর্যালোচনার সময় এই ধরনের কমিটি গঠন করা হয়নি। এবার শুধু কমিটি গঠন নয়, কমিটিগুলিতে দেশীয় বিশেষজ্ঞদের পাশাপাশি বিশ্বব্যাঙ্ক, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক (এডিবি) এবং ম্যাকিন্‌সের মতো সাম্রাজ্যবাদী সংস্থার প্রতিনিধিদের সদস্য হিসাবে নিয়োগ করে। এর আগে নানা বিষয়ে বিদেশি বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ, মতামত নিলেও বিদেশি ঋণদানকারী এবং পরামর্শদাতা সংস্থার প্রতিনিধিদের কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিশনের মতো দেশের নীতি নির্ধারক একটি সংস্থার সদস্য হিসাবে নিয়োগের ঘটনা এই প্রথম।

সিপিএম ও তার সহযোগী দলগুলি সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধতা করে। সিপিএমের ঘনিষ্ঠ যেসব অর্থনীতিবিদদের ঐ কমিটির সদস্য করা হয়েছিল, তাঁরা চাপ দেওয়ার জন্য একযোগে পদত্যাগ করার হুমকি দেন। এরপরই বিদেশি সংস্থাগুলির প্রতিনিধিরা কমিটি থেকে সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, এঁদের পদত্যাগের পরে পরেই যোজনা কমিশন সমস্ত উপদেষ্টা কমিটিগুলিই ভেঙে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। কমিশনের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, পূর্বেকার মতই বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে ব্যক্তিগত স্তরে পরামর্শ নেওয়া হবে। দেশের বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে যেমন নেওয়া হবে ; বিশ্বব্যাঙ্ক, এডিবি, ম্যাকিন্‌সের কাছ থেকেও পরামর্শ নেওয়া হবে। কোন পরামর্শদাতা কমিটি করা হবে না, ফলে তার সদস্য নেওয়ারও প্রশ্ন থাকছে না।

এ ঘটনার যে ব্যাখ্যাই সরকার দিক না কেন, এ কথা স্পষ্ট যে বিদেশি সংস্থার প্রতিনিধিদের নিয়োগ করাই ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান উদ্দেশ্য। তা নাহলে পরিস্থিতির চাপে তাঁরা পদত্যাগ করতে বাধ্য হওয়ায় সমস্ত কমিটিগুলিই ভেঙে দেওয়া হল কেন? এদেশে অর্থনীতি এবং পরিকল্পনা সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষজ্ঞের অভাব আছে এমন নয়। কিংবা এইসব পদত্যাগী মানুষগুলি বিরাট বিরাট অর্থনীতি বিশেষজ্ঞ বলে সদস্যপদ পেয়েছিলেন তা নয়। যোজনা কমিশনে এঁরা যোগ দিয়েছিলেন ব্যক্তি হিসাবে নয়, বিশ্বব্যাঙ্ক, এডিবি কিংবা ম্যাকিন্‌সের মতো বিশেষ আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধি হিসাবে। এই সংস্থাগুলির কাজ কী? বিশ্বব্যাঙ্ক ও এডিবি ঋণদানকারী সংস্থা এবং ম্যাকিন্‌সে হচ্ছে আর্থিক নীতি বিষয়ে একটি পরামর্শদাতা সংস্থা। এদের কোনটিই দাতব্য প্রতিষ্ঠান নয়; এরা সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়া পুঁজি-মালিকদের স্বার্থরক্ষায় কাজ করে। বিশ্বায়ন, উদারীকরণ ও বেসরকারীকরণের যে কার্যক্রম চলছে, দেশে দেশে সে কাজের অগ্রগতি কতদূর তা দেখভাল করাই এদের মূল কাজ। বিশ্বব্যাঙ্ক এবং এডিবি বিভিন্ন প্রকল্পে ঋণের যোগান দিয়ে দরিদ্র দেশগুলিকে একদিকে ক্রমাগত ঋণের জালে জড়িয়ে ফেলে, অন্যদিকে চাপিয়ে দেওয়া নানা শর্ত পালনে বাধ্য করে এইসব দেশের বাজার সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়া পুঁজিমালিকদের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়। পরামর্শদাতা সংস্থা ম্যাকিন্‌সের কাজ হল দেশের বিভিন্ন সরকারগুলিকে এমনভাবে নীতিনির্ধারণে পরামর্শ দেওয়া যাতে ঐসব বাজারে সহজেই সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি অবাধে ঢুকতে পারে — যেটাকেই অর্থনীতির পরিভাষায় বলা হচ্ছে নয়া উদারনীতি।

এহেন সংস্থাগুলির প্রতিনিধিরা পরিকল্পনার অন্তর্বর্তীকালীন পর্যালোচনায় পরামর্শ দেওয়ার নামে বেসরকারীকরণের কার্যক্রম সহ সকল ক্ষেত্রে নয়া উদারনীতির ফর্মুলা ও শর্তগুলি পালিত হচ্ছে কিনা সে বিষয়েই যে খোঁজখবর করবে এবং সেরকম ব্যবস্থা নিতেই যে সরকারকে পরামর্শ দেবে — এ কথা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। প্রশ্ন হল, এদের পরামর্শ পাওয়ার জন্য কেন্দ্রের ইউপিএ সরকারের এত ব্যগ্রতার কারণ কী?

আসলে বিদেশি একচেটিয়া পুঁজিমালিকদের সঙ্গে যেন তেন প্রকারেণ ঘনিষ্ঠতা গড়ে তুলতে ভারতবর্ষের একচেটিয়া পুঁজিপতিরাই প্রবল আগ্রহী। এই ঘনিষ্ঠতার দ্বারা দেশীয় বাজারের কিছু অংশ তাদের ছেড়ে দিয়ে বিশ্ববাজারে ভাগ পেতে চায় ভারতীয় বৃহৎ পুঁজির মালিকরা। এনিয়ে দরকষাকষি বহু বছর ধরেই চলছে। বাজার সংকটে জর্জরিত ভারতীয় একচেটে পুঁজিপতিদের এই স্বার্থকে চরিতার্থ করার জন্যই কংগ্রেস পরিচালিত ইউপিএ সরকার আর্থিক নীতিনির্ধারণে স্থান দেবার চেষ্টা করেছিল সাম্রাজ্যবাদী সংস্থার প্রতিনিধিদের। যোজনা কমিশনের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থায় সাম্রাজ্যবাদী সংস্থার প্রতিনিধিদের সংযুক্ত করার এই ঘটনায় কংগ্রেসের নগ্ন সাম্রাজ্যবাদ ঘেঁষা চরিত্রটি আবার যেমন উদ্‌ঘাটিত হল, তেমনি আবারও প্রমাণ হয়ে গেল যে, নয়া শিল্প ও আর্থিক নীতি ভারতীয় শাসক পুঁজিপতিশ্রেণীরই নীতি হওয়ায় এই প্রশ্নে দেশের দুই প্রধান পুঁজিবাদী দল বিজেপি ও কংগ্রেসের মধ্যে কোনও মৌলিক তফাৎ নেই।

একথা সত্য যে, যোজনা কমিশনে বিদেশি সংস্থার প্রতিনিধি নিয়োগের বিরুদ্ধতা করেছে সি পি এম ও তার সহযোগী দলগুলি। তাদের বক্তব্য ছিল, এইসব বিদেশি সংস্থা মূলত আমেরিকার কথায় চলে। ফলে এদের প্রতিনিধিদের কমিটিতে রাখা হলে নীতিনির্ধারণে কার্যত আমেরিকার হস্তক্ষেপ ঘটবে, যেটা ভারতের সার্বভৌমত্বকেই ক্ষুণ্ণ করবে।

এই বক্তব্য থেকে মনে হতেই পারে যে, সিপিএম নেতৃত্ব যেন ভারতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির প্রবেশের প্রবল বিরোধী, সেজন্য এইসব সংস্থাগুলির কোনরকম সংসর্গই তারা পছন্দ করে না। কিন্তু সত্যই কী তাই?

১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে সরকার গঠন করার পরমুহূর্ত থেকেই সিপিএম বিশ্বব্যাঙ্ক সহ অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী ঋণদানকারী সংস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে তুলেছে। '৭৮ সালেই বিশ্বব্যাঙ্ক থেকে সিপিএম ফ্রন্ট সরকার ৮ কোটি ৭০ লক্ষ ডলার ঋণ নিয়েছে। এরপর চলেছে বিশ্বব্যাঙ্ক সহ অন্যান্য বিদেশি সংস্থার কাছ থেকে যাবতীয় শর্ত মেনে একের পর এক প্রকল্পে ঋণগ্রহণের পালা। কলকাতা শহর উন্নয়ন প্রকল্পে এসেছে ৫ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা। ১৯৮৩-তে বিশ্বব্যাঙ্ক আবার ১৪ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা ঋণ দেয়। সেই '৮২ সালে বিশ্বব্যাঙ্কের এক কর্তা সিপিএম ফ্রন্ট সরকারকে 'সার্টিফিকেট' দিয়ে বলেছিলেন, বিশ্বব্যাঙ্ক ৯৬টি দেশে ১৩৯টি শহরে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে (পড়ুন ঋণদান প্রকল্পে) যুক্ত, কিন্তু কলকাতার মতো এমনভাবে আর কোথাও জড়িয়ে পড়েনি। হালে ২০০২-'০৩ সালে বিশ্বব্যাঙ্কের কাছ থেকে এ রাজ্য ঋণ নিয়েছে ১৬৩ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা। অন্যান্য সূত্র থেকে এসেছে ১৩৯ কোটি টাকা যার বেশিটাই বিদেশি সাহায্য। শুধু বিশ্বব্যাঙ্ক নয়, এ রাজ্যে এডিবি-র ২০ কোটি টাকা খাটছে এই মুহূর্তে। এছাড়া বিভিন্ন প্রকল্পে জার্মানি, হল্যান্ড, ব্রিটেনের মতো বহু সাম্রাজ্যবাদী দেশের বিপুল অর্থ এ রাজ্যে খাটানো হচ্ছে। শুধু তাই নয়, সিপিএম ফ্রন্ট সরকার ম্যাকিন্‌সেকে দিয়ে নয়া কৃষিনীতি তৈরি করিয়েছে, দেশি-বিদেশি বৃহৎ পুঁজির স্বার্থে এ রাজ্যে তা রূপায়ণও করছে, যার ধাক্কা ইতিমধ্যেই চাষীজীবনে পড়তে শুরু করেছে। (তথ্যসূত্র ঃ দৈনিক স্টেটসম্যান, ৩০-৯-০৪)

বিদেশি ঋণের প্রতিটি পাই-পয়সার জন্য শুধু সুদ গুণে দিতে হচ্ছে তাই নয়, প্রতিটি ঋণ-অর্থের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে ঋণদাতা সংস্থাগুলির চাপানো বহুবিধ বিপজ্জনক শর্ত। তাদের সেই শর্ত মেনেই নির্বিচারে চলছে খালপাড়ে, রেললাইনের ধার থেকে জনবসতি উচ্ছেদ, হকার উচ্ছেদের পালা। এদেরই কথা মতো তৈরি করা হচ্ছে শিক্ষানীতি-শিল্পনীতি। এই ঋণদাতা সংস্থাগুলির কড়া নির্দেশ শিরোধার্য করে আজ সরকার জনপরিষেবার নানা খাতে ভর্তুকি ব্যবস্থা তুলে দিচ্ছে। শিক্ষা পেতে হলে, কিংবা অসুখে চিকিৎসা পেতে হলে কড়ায়-গণ্ডায় উচ্চ দাম গুণে দিতে হচ্ছে এ রাজ্যের সাধারণ মানুষকে। দাম বাড়ছে সার, কীটনাশকসহ যাবতীয় কৃষি উপকরণের। দলে দলে কৃষক আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে। এদের শর্তেই পানীয় জলে কর বসছে। রাস্তা, ব্রিজ ব্যবহার করলে সাধারণ মানুষকে 'টোলট্যাক্স' দিতে হচ্ছে। ই আর এস, ভি আর এসের কৌশল চালু করে কলকারখানা অফিস কাছারিতে কীভাবে কর্মীসংখ্যা কমানো যায় সেই পরামর্শও এই সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজির তল্পিবাহক সংস্থাগুলি রাজ্য সরকারকে দিচ্ছে এবং রাজ্য সরকারও বিনা প্রশ্নে তা মেনে নিচ্ছে। এ রাজ্যের সরকারি সংস্থা ওয়েবেল বন্ধ করে দিতে শ্রমিকদের আগাম অবসরের জন্য টাকা দিচ্ছে ব্রিটিশ সংস্থা ডি এফ আই ডি। রাজ্য বাজেটের ব্যাপারেও আলোচনা করা হচ্ছে এই সংস্থার সঙ্গে।

এই অবস্থায় সিপিএম নেতাদের মুখে 'যোজনা কমিশনে সাম্রাজ্যবাদী সংস্থার প্রতিনিধিদের রাখা চলবে না' বলে হুংকার কি লোকঠকানো নয়? এটা আরও স্পষ্ট হয়ে যায় যখন মন্টেক সিং আলুওয়ালিয়াকে 'বিশ্বব্যাঙ্কের লোক' বলে আসর গরম করে দেবার পরেই আবার সুর নরম করে সিপিএম নেতারা জানান যে, বিদেশি সংস্থার প্রতিনিধিদের শুধুমাত্র কমিটিতে রাখার ব্যাপারেই তাঁদের আপত্তি, পরামর্শ, মতামত নেওয়ার ব্যাপারে নয়। এ কেমন বিরোধিতা? ওদের পরামর্শ মেনে চলব ; ওদের দেওয়া ঋণের টাকা নেব, ঋণের শর্ত মেনে চলব। সবই চলবে, শুধু ওদের কমিটিতে রাখা চলবে না — এ কোন ধরনের নৈতিকতা ? আসলে কংগ্রেসের সাথে নকল বিরোধ দেখাবার ও নিজেদের সাম্রাজ্যবাদ ঘেঁষা ভূমিকা আড়াল করার জন্যই তাদের এই বিরোধিতা দেখাতে হচ্ছে। নাহলে প্রধানমন্ত্রীর সাথে বৈঠকের পরই সিপিএম নেতারা সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন কোন্ যুক্তিতে?

এইভাবে দ্বিচারিতার আশ্রয় নিয়ে সহজে বাজিমাৎ করার চেষ্টায় সিপিএম নেতৃত্ব শুধু দেশের সাধারণ মানুষকে ও নিজেদের দলের সৎ কর্মীদের প্রতারণা করছে তাই নয়, এর দ্বারা সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী আক্রমণের বিরুদ্ধে সারা দেশের মানুষকে একজোট করে শক্তিশালী গণআন্দোলন গড়ে তোলার কাজেও বাধা সৃষ্টি করছে। এই সমস্ত দলগুলির সৎ কর্মী-সমর্থক যাঁরা ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজি ও বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই গড়ে তুলতে চান, তাঁদের বুঝতে হবে যে, সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির ভজনা করে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা যায় না, বরং ঐ লড়াইয়ের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাই করা হয়।

ওয়েবেলে দাস-শ্রমিক

এস ইউ সি আই-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ৩ অক্টোবর এক বিবৃতিতে বলেন ঃ

"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি সংস্থা ওয়েবেল-এর কর্মচ্যুত কিছু শ্রমিককে ওয়েবেল টেকনোলজি লিমিটেডে যে শর্তে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ করা হচ্ছে, তা গণতান্ত্রিক অধিকার ও শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের পক্ষে অতীব বিপজ্জনক।

কালা চুক্তির শর্ত অনুযায়ী, কর্তৃপক্ষ বললে এই শ্রমিকরা কাজের নির্দিষ্ট সময় ছাড়াও অতিরিক্ত সময় এবং ছুটির দিনেও কাজ করতে বাধ্য থাকবে। শ্রমিকদের রাজনীতি করা, ধর্মঘট বা অন্য কোনও প্রতিবাদ আন্দোলন করার অধিকার থাকবেনা। এইভাবে শ্রমিকদের 'দাস শ্রমিক'-এ পরিণত করার ফ্যাসিস্ট পদক্ষেপ ইতিপূর্বে বি জে পি বা কংগ্রেস পরিচালিত কোনও সরকারও করতে সাহস করেনি, যেটা সি পি এম বামপন্থার নামে করছে। এটা পুনরায় প্রমাণ করে যে, দেশি-বিদেশি পুঁজির স্বার্থে সিপিএম শ্রমিক আন্দোলন দমনকারী ফ্যাসিস্ট ভূমিকা নিচ্ছে এবং অন্যান্য রাজ্যের সরকার ও বেসরকারি মালিকদের পথ দেখাচ্ছে। আমরা এই কালা চুক্তির তীব্র প্রতিবাদ করছি ও প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছি।"

মেদিনীপুরে মিড-ডে মিলের চাল চুরির প্রতিবাদ

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রাম থানার ২৪টি ও হলদিয়া পৌরসভা এলাকার ১২টি মাধ্যমিক স্কুলের পঞ্চমশ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা দীর্ঘ ৬ বছর যাবৎ মিড-ডে মিলের চাল পাচ্ছে না। অথচ চাল পরিবহনের খরচ ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে আদায় করছে স্কুল কর্তৃপক্ষ — যদিও সরকারই এই খরচের টাকা দিয়ে থাকে। ঐ ব্লকের শুভানিচক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে মাথা পিছু ৭ টাকা করে নিয়েছেন ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষক, কোন কোন স্কুলে মাথাপিছু ৩ টাকা নেওয়া হয়েছে। হলদিয়া পৌর এলাকার বিরিঞ্চিবেড়িয়া, তেতুঁলবেড়িয়া প্রভৃতি গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের চাল না দিয়ে স্কুল উন্নয়নের নামে, কোথাও স্কুলে উৎসবের নামে ঐ চাল বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। গ্রামীণ এলাকার রাস্তা ঘাটের উন্নয়নের জন্য দরিদ্র মানুষদের কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্পের (এস জি আর ওয়াই) হাজার হাজার কুইন্ট্যাল চাল ডিলাররা খোলা বাজারে বিক্রি করে দিচ্ছে সরকারি দলের নেতাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে।

এর প্রতিবাদে তদন্ত সাপেক্ষে দোষীদের গ্রেপ্তার ও শাস্তির দাবিতে ২৭ সেপ্টেম্বর এস ইউ সি আই মেদিনীপুর জেলা সম্পাদক কমরেড মানব বেরার নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল পূর্ব মেদিনীপুর জেলাশাসক দপ্তরে স্মারকলিপি জমা দেন। অতিরিক্ত জেলা শাসক দাবিগুলি বিবেচনার আশ্বাস দেন।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে ভেনিজুয়েলার

গণভোটে হুগো শ্যাভেজ পুনরায় জয়ী

জনগণ যখন দৃঢ়প্রত্যয়ে স্থির এবং উদ্দেশ্য সাধনে ঐক্যবদ্ধ তখন বিশ্বের তাবড় শক্তির ষড়যন্ত্রও ব্যর্থ হতে বাধ্য। এমনটাই হল সম্প্রতি ভেনিজুয়েলাতে। মার্কিন চক্রান্তে এই দেশের জনপ্রিয় রাষ্ট্রপতি হুগো শ্যাভেজকে ক্ষমতা থেকে সরানোর উদ্দেশ্যে গত ১৫ আগস্ট যে গণভোট হল তাতে শ্যাভেজ ৫৮% ভোট পেয়ে রাষ্ট্রপতি পদে থাকার ছাড়পত্র পেয়েছেন। ভেনিজুয়েলার সংবিধানে গণভোটের বিধান অন্তর্ভুক্ত করেন স্বয়ং শ্যাভেজ ১৯৯৮ সালে ক্ষমতায় বসার পরই। এই আইন অনুযায়ী দেশের রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে জনগণের অসন্তোষ ও অবিশ্বাস সৃষ্টি হলে প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্বাক্ষরের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতির অপসারণ চেয়ে গণভোট দাবি করা যাবে। মার্কিন মদতপুষ্ট শ্যাভেজ-বিরোধীরা এই গণভোটকে হাতিয়ার করে শ্যাভেজকে সরাবার মতলব করেছিল, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের তাঁবেদার সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি ও ক্রিশ্চান ডেমোক্র্যাটিক পার্টি যৌথভাবে ১৯৫৮ সাল থেকে ভেনিজুয়েলাকে শাসন করে আসছিল। মার্কিন শাসকরা পরম নিশ্চিন্তে ল্যাটিন আমেরিকার ঐ ছোট্ট কিন্তু খনিজ তেলসমৃদ্ধ দেশের তেল সামান্য দামের বিনিময়ে প্রায় লুঠে নিচ্ছিল। গত শতাব্দীর ৯০ দশকের মাঝামাঝি থেকে এই নিরবচ্ছিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণে বাধা পড়ল। এই শোষণ নিপীড়নের বিরুদ্ধে ভেনিজুয়েলার সাধারণ মানুষ তো বটেই এমনকী সেনাবাহিনীর একাংশও প্রবল বিক্ষুব্ধ হয়ে এর অবসানের রাস্তা খুঁজছিল। ঠিক এই সময়ই লেফটেন্যান্ট কর্ণেল হুগো শ্যাভেজের নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর একাংশ ১৯৯৮ সালে এক সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ভেনিজুয়েলার শাসন ক্ষমতায় আসে। যদিও সামরিক অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়েই ক্ষমতায় এসেছিলেন, তবুও শ্যাভেজ জনগণের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী তথা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মনোভাবকে শাসন পরিচালনায় অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। বস্তুত শ্যাভেজ হচ্ছেন মনেপ্রাণে একজন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, বিশেষ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী দেশপ্রেমিক। এই অবস্থান থেকেই তিনি ভেনিজুয়েলার জনসাধারণকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। শ্যাভেজ ক্ষমতায় এসেই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বৃহৎ তেল কোম্পানিগুলির জাতীয়করণ করেন, সাথে সাথে মার্কিন মদতপুষ্ট ভেনিজুয়েলার শক্তিশালী 'তেল চক্র'র বিষ দাঁত ভেঙে দিয়ে তেল উৎপাদনকারী কোম্পানিগুলির নতুন বোর্ড গঠন করেন। এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার অলিন্দ থেকেও ঐ সাম্রাজ্যবাদী চক্রের অশুভ প্রভাব নির্মূল করেন। ২ কোটি ৩৭ লক্ষ মানুষের আবাসভূমি ভেনিজুয়েলা বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম তেল রপ্তানিকারী দেশ। অথচ, দেশের ৬৫ শতাংশ মানুষই গরিব, এর মধ্যে ৩৫ শতাংশ আবার অত্যন্ত গরিব। এই দেশ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার প্রয়োজনের ১০% তেল যৎকিঞ্চিৎ দামে, প্রায় লুণ্ঠন করে বৃহত্তম আমদানিকারী দেশ হিসাবে সুবিধা ভোগ করত। হুগো শ্যাভেজ ক্ষমতায় বসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তেল রপ্তানি ব্যাপকভাবে কমিয়ে দেন। বিশ্বের অধীশ্বর বলে দাবিদার মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের গালে এ ছিল সজোরে এক চপেটাঘাত। শুধু তাই নয়, শ্যাভেজ পূর্ববর্তী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ক্রীড়নক সরকারগুলো সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের অংশীদার হয়ে উদারীকরণ-বেসরকারীকরণ নীতি চালু করে ভেনিজুয়েলার জনসাধারণকে প্রায় ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছিল। শ্যাভেজ এই নীতির ওপর বহুক্ষেত্রে কঠোরভাবে পুরানো নিয়ন্ত্রণ ফিরিয়ে আনেন। তিনি সামাজিক বৈষম্য কমাবার লক্ষ্যে ৪৯টি আইন চালু করেছিলেন, যার মধ্য দিয়েই নয়া উদারনীতিবাদের রাশ টানার প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন। এই আইনগুলোর মধ্য দিয়ে জনপরিষেবামূলক খাতে (Public Utility Sectors) অর্থবরাদ্দ বাড়িয়ে, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যকে মৌলিক অধিকার হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল। এই প্রথম লক্ষ লক্ষ গরিব শিশু বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ পেল। ১০ লক্ষ মানুষ সাক্ষরতা কর্মসূচিতে যোগ দেয়, রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় খোলা হয় যেখানে গরিব ঘরের ছাত্রদের স্কলারশিপ দিয়ে পড়ার ব্যবস্থা হয়। লক্ষ লক্ষ গরিব ঝুপড়িবাসী মানুষ, যারা এতকাল চিকিৎসার কোনও সুযোগই পায়নি, এবার কিউবা থেকে আগত স্বেচ্ছাসেবক ডাক্তারদের সহায়তায় তারা চিকিৎসা পেতে শুরু করে। পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রগুলোর উপর শ্যাভেজ জোর দিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি একটি নতুন সংবিধানও চালু করেছিলেন, যাকে তিনি বলিভারীয় (ল্যাটিন আমেরিকায় আপসহীন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের মূর্ত প্রতীক সাইমন বলিভার-এর নাম অনুসরণে) সংবিধান নামে আখ্যা দিয়েছিলেন। শ্যাভেজের আমলেই ভেনিজুয়েলার বেকার সংখ্যা ১৮ শতাংশ থেকে ১২ শতাংশে নেমে আসে। শ্যাভেজ ভূমি সংস্কারেও হাত দিয়েছিলেন। ভেনিজুয়েলাতে আগে ১ শতাংশ ধনী চাষী ৪৬ শতাংশ কৃষি জমির মালিক ছিল। ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা এত বেশি ছিল যে তাদের হিসাব কেউ রাখত না। যে ভূমিহীন কৃষকদের ধনীচাষী এবং খামার মালিকরা উচ্ছেদ করেছিল, শ্যাভেজ ভূমি সংস্কার করে তাদের সমস্ত জমি ফিরিয়ে দেন। ১৯৬০ সাল থেকে জমি উদ্ধারের যে সুদীর্ঘ লড়াই কৃষকরা করছিল, এই ভূমিসংস্কার তাদের সেই কাঙ্ক্ষিত সাফল্য এনে দিল। ভূমিসংস্কারের মধ্য দিয়ে ২২ লক্ষ ৬০ হাজার হেক্টর জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিলি করা হয়েছিল। এতে ধনীচাষী ও খামার মালিকরা প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে ব্যাপক হিংসার আগুন ছড়িয়ে দেশে অস্থিরতা সৃষ্টির অপচেষ্টা করেছিল। কিন্তু সাধারণ কৃষকদের প্রতিরোধে তা ব্যর্থ হয়। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা ধনী চাষীদের এই আক্রমণকে ''ভূমিরক্ষক ও ভুঁইফোড় গেরিলাদের মধ্যে লড়াই'' বলে অভিহিত করে বুঝিয়ে দিয়েছিল যে, মার্কিন শাসকদের সহানুভূতি ঐ ধনী চাষী বা জোতদারদের দিকেই।

এরই পাশাপাশি শ্যাভেজ ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করছেন। শ্যাভেজ হচ্ছেন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ল্যাটিন আমেরিকান জাতীয়তা ও ঐক্যের প্রবক্তা। ল্যাটিন আমেরিকার একমাত্র সমাজতান্ত্রিক, আপসহীন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী দেশ কিউবা। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা তাকে অন্যান্য দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার চেষ্টা করেছিল। শ্যাভেজ তা শুধু বানচাল করে দেননি, কিউবাকে ল্যাটিন আমেরিকার নেতা হিসাবে ঘোষণা করলেন, তার সাথে গভীর সম্পর্ক গড়ে তুললেন। কিউবার উপর বহু বছর ধরে মার্কিন শাসকদের অর্থনৈতিক অবরোধ অগ্রাহ্য করে, শ্যাভেজের নেতৃত্বে ভেনিজুয়েলা কিউবার অনুকূল শর্তে তেল রপ্তানি করতে শুরু করেছিল। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের পদলেহনকারী ভেনিজুয়েলার 'তেলচক্র' এই প্রচেষ্টাকে বানচাল করতে চেয়েছিল। কিন্তু শ্যাভেজ সেই চক্রান্তের জাল ছিন্ন করে দিয়েছিলেন। এই উদ্দেশ্যেই শ্যাভেজ পুরনো তেল পর্ষদ ভেঙে দিয়ে নতুন পর্ষদ গঠন করেছিলেন। এমনকী বাধা সৃষ্টিকারী বেশ কিছু মিলিটারি জেনারেলকেও তিনি সরিয়ে দিয়েছিলেন।

শুধু ল্যাটিন আমেরিকায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের আধিপত্যের বিরুদ্ধে হুগো শ্যাভেজ প্রতিবাদী ভূমিকা পালন করেননি, তিনি পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে — যুগোশ্লাভিয়া, আফগানিস্তান, ইরাক — যেখানেই সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন হয়েছে তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। ঐ আক্রান্ত দেশগুলোর পাশে ভেনিজুয়েলাকে সামিল করেছেন। কলম্বিয়াকে দখল করার উদ্দেশ্যে মার্কিন ষড়যন্ত্রীকারীদের তৈরি করা 'কলম্বিয়া প্ল্যান'-এর তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন শ্যাভেজ। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে কলম্বিয়া গেরিলাদের প্রতিরোধ সংগ্রাম এবং তার নেতৃত্বকারী সংগঠন এফ এ আর সি-কে অকুণ্ঠ সমর্থন দিয়েছিলেন তিনি। ইরাকের আকাশে বিমান চলাচল নিষিদ্ধ করে জারি করা মার্কিন হুকুম অগ্রাহ্য করে শ্যাভেজ ২০০২ সালে স্বয়ং বিমানে গিয়ে প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হুসেনের সাথে দেখা করেন।

আমেরিকার প্রায় কোলের কাছে অবস্থিত ছোট্ট দেশ ভেনিজুয়েলার শাসনক্ষমতা থেকে এমন এক প্রবল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ব্যক্তিত্বকে মার্কিন শাসকরা উচ্ছেদ করতে চাইবে, এটাই স্বাভাবিক। তাই ১৯৯৮ সালে ভেনিজুয়েলার জনসাধারণের দ্বারা বিপুল ভোটে নির্বাচিত হওয়ার পর জনজীবনে অর্থনৈতিক সঙ্কটকে অজুহাত করে শ্যাভেজকে সরাবার দাবিতে গণভোটের দাবি তোলে দেশের পুঁজিপতি ও দুর্নীতিগ্রস্তরা। অর্থনৈতিক নীতির প্রশ্নে নেওয়া এই গণভোটেও শ্যাভেজ জিতেছিলেন। এখানে ব্যর্থ হয়ে এই ষড়যন্ত্রীরা ভেনিজুয়েলার শিল্পপতিদের সংগঠন 'ফেডেকামারাস' এবং ভেনিজুয়েলার চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল ও মার্কিন সমর্থক শ্রমিক সংগঠন সিটিভি'র (CTV) সঙ্গে যোগসাজসে ১০ ডিসেম্বর ২০০১ থেকে দেশের শিল্প কলকারখানায় লকআউট ঘোষণা করে দেয়। মতলব ছিল শ্যাভেজকে জনগণের স্বার্থে অনুসৃত নীতি বিসর্জন দিতে বাধ্য করা। কিন্তু শ্যাভেজকে টলানো যায়নি। এরপরেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা ভেনিজুয়েলার সামরিক বাহিনীর একাংশকে ''বিক্ষুব্ধ সামরিক বাহিনী'' বানিয়ে তার সাথে 'ফেডেকামারাস' ও 'সিটিভি'র যোগসাজসে জাল বিস্তার করে ২০০২ সালের ১১ এপ্রিল একটা সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে দেয়। শ্যাভেজকে বন্দী করে লা অরভিলা দ্বীপে গোপনে সরিয়ে দেওয়া হয়। তাঁর জায়গায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা এক চূড়ান্ত দুর্নীতিগ্রস্ত শিল্পপতি যে শত শত কোটি ডলার কর ফাঁকি দিয়ে ভেনিজুয়েলাকে সর্বস্বান্ত করেছিল, সেই পেড্রো কারমোনাকে রাষ্ট্রপতি করে ক্ষমতায় বসায়। চেয়ারে বসেই এই কারমোনা শ্যাভেজের জনমুখী সমস্ত নীতি বাতিল করে দিয়েছিল। ভেনিজুয়েলার ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি, সুপ্রিম কোর্ট, এ্যাটর্নী জেনারেল ও কম্পট্রোলার অফিস খারিজ করে স্বৈরাচারি শাসন কায়েম করেছিল। এমনকী ১৯৯১ সালে যে নতুন সংবিধান জনস্বার্থে শ্যাভেজ চালু করেছিলেন তাও বাতিল করে দিয়েছিল।

নির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে এভাবে ক্ষমতাচ্যুত করার বিরুদ্ধে গোটা ল্যাটিন আমেরিকায় প্রতিবাদ উঠেছিল। ভেনিজুয়েলার জনসাধারণও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্তে ঘটানো সামরিক অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে প্রবল বিস্ফোরণের মত ফেটে পড়েছিল। এই গণবিক্ষোভের তাপ এত তীব্র ছিল, এত ব্যাপক ছিল, এর চেহারা এত জঙ্গি ছিল যে, তা এক গণঅভ্যুত্থানের রূপ নিয়েছিল। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের দেশীয় দোসররা ভয় পেয়ে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে রাষ্ট্রপতি কারমোনাকে দিয়ে জাতীয় সভা (National Assembly) পুনরুজ্জীবিত করাতে বাধ্য হয়েছিল এবং শ্যাভেজকে মুক্ত করে পুনরায় রাষ্ট্রপতিপদে ফিরিয়ে আনতেও হয়েছিল। এইভাবেই ভেনিজুয়েলার জনসাধারণ এক অসাধারণ লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত ব্যর্থ করেছিল।

কিন্তু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের ও ভেনিজুয়েলার প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের এই ষড়যন্ত্র তখনকার মত ব্যর্থ হলেও তা থামেনি। মাঝে মাঝেই মার্কিন মতদপুষ্ট শিল্পসংস্থার মালিকরা ও তাদের পোষা শ্রমিক ইউনিয়নগুলি ধর্মঘট ডেকে রাস্তায় রাস্তায় হিংসাত্মক কার্যকলাপ চালিয়ে শ্যাভেজ সরকারকে ফেলে দেওয়ার চক্রান্ত চালিয়ে গেছে। কিন্তু এমন প্রতিটি চক্রান্তই জনসাধারণ ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ব্যর্থ করে দিয়েছিল। এই চক্রান্তের সূত্র ধরে ধনকুবের গোষ্ঠী ও তাদের রাজনৈতিক বশংবদরা সর্বশেষ গণভোটের দাবি তুলেছিল। গত ১৫ আগস্টের গণভোটেও এদের এই চক্রান্ত লক্ষণীয়ভাবে ব্যর্থ হল। আবার ব্যাপক ভোটে পেয়ে শ্যাভেজ ক্ষমতায় থাকার ছাড়পত্র পেয়েছেন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, শাসনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই অপছন্দের শাসককে শাসন ক্ষমতা থেকে সরাবার যে অধিকার গণতন্ত্রের মহান(!) ধ্বজাধারী আমেরিকা, ব্রিটেন সহ পৃথিবীর কোন বুর্জোয়া রাষ্ট্রেরই সংবিধান তাদের দেশের জনগণকে দেয়নি, হুগো শ্যাভেজই প্রথম তাঁর ১৯৯৯ সালে চালু করা নতুন সংবিধানে এই গণভোটের (referendum) অধিকার জনসাধারণকে দিয়েছেন, যার সুযোগ নিয়েই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের অর্থে লালিত 'ন্যাশনাল এনডাউমেন্ট ফর ডেমোক্রেসি' নামের আড়ালে 'সুমাতে' নামের এক প্রতিক্রিয়াশীল শ্যাভেজবিরোধী গোষ্ঠীর মাধ্যমে এই গণভোটের দাবি তুলিয়েছিল। ভোটে হেরেই মার্কিন শাসকদের মদতপুষ্ট এই মুষ্টিমেয় বিরোধীরা ভোটে জালিয়াতির অভিযোগ তুলেছে।

অবশ্য এবারের গণভোট জনগণের উৎসবে পরিণত হয়েছিল, জনগণ যেমন সংগঠিতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে ভোট দিয়েছে, তাতে জালিয়াতির অভিযোগ দাঁড় করানো যাচ্ছে না। এমনকী আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক সংস্থাগুলিও ভোটের জালিয়াতির কথা বলছে না। অবশ্য তাতে আশ্বস্ত হওয়ার নেই, কারণ, দেশীয় কায়েমীস্বার্থবাদীদের মাধ্যমে শ্যাভেজকে হটানোর ষড়যন্ত্র মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা চালিয়ে যাবেই। কোকাকোলার মতো কোম্পানিগুলোই শ্যাভেজকে হঠানোর পরিকল্পনার প্রধান মদতদাতা। এখানকার শ্রমিকরা ইতিপূর্বে একবার গণভোট করার দাবির বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ায় মালিক এদের অনেককে ছাঁটাই করেছিল, মালিকী হুমকির মুখে পড়তে হয়েছিল অনেককে। কোকাকোলার ভেনিজুয়েলা শাখাটির মালিক হচ্ছে কোটিপতি গ্রাস্তাভো সিস্‌নেরো, ইনি শ্যাভেজবিরোধীদের যেমন টাকার থলি যোগান দেন, আবার দেশের বৃহত্তম টিভি চ্যানেলের মালিক হওয়ার সুযোগে শ্যাভেজবিরোধী প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন বহু বছর ধরে।

ভেনিজুয়েলার ধনীরা চায় দেশের তেলসহ সকল সম্পদ ব্যক্তিমালিকানায় থাকুক, তারা যেমন ইচ্ছা তার ব্যবহার করবে, আমেরিকায় রপ্তানি করবে, ব্যক্তিগতভাবে মুনাফা লুটবে। শ্যাভেজ তাতে বাধা, তিনি চান দেশের তেলসম্পদ কাজে লাগিয়ে সামাজিক সমস্যার কিছুটা সুরাহা করতে, বেকারি কিছুটা কমাতে। এজন্য ধনীদের মধ্যে শ্যাভেজের শত্রু তৈরি হয়েছে।

ভেনিজুয়েলার ঘটনা প্রমাণ করে যে, বিশ্বের কোথাও কোন দুর্বল দেশের স্বাধীন অবস্থান, সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে দেশের জনগণের স্বার্থে ন্যূনতম ভূমিকাও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা মেনে নেবে না। ইতিপূর্বেও শ্যাভেজকে খুন করার চেষ্টা হয়েছিল। আবার হয়তো তা হবে। কারণ, শ্যাভেজের জয় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের উপর বিরাট আঘাত। কিন্তু ভেনিজুয়েলার মানুষ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্রকে রুখতে বদ্ধপরিকর, সেজন্য কেবল মানসিক প্রস্তুতি নয়, সাংগঠনিক প্রস্তুতিও তারা গড়ে তুলছে, গণসংগঠন গড়ছে প্রয়োজনে দেশরক্ষায় দেশীয় সেনাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য।

পরপর শিশুমৃত্যুও মন্ত্রীদের এখন বিচলিত করে না

গত ২৭ সেপ্টেম্বর, সোমবার ভোররাতে বিধানচন্দ্র রায় শিশু হাসপাতালে বিদ্যুৎ বিভ্রাট এবং তার ফলে চারটি শিশুমৃত্যুর ঘটনা ও সেই সম্পর্কে বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও মন্ত্রীবর্গের প্রতিক্রিয়া নতুন করে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল সেই চিরপুরাতন সত্যটি — আমাদের দেশে গরিব সাধারণ মানুষের জীবন প্রশাসন ও নেতৃবর্গের কাছে কতটা মূল্যহীন। সাধারণ মানুষের দুঃখ-কষ্ট, এমনকি প্রাণহানির মত ঘটনাও তাদের মধ্যে তোলে না সামান্যতম অনুভূতির অনুরণন। তাই ঘটনাস্থল থেকে অনেকটা দূরে বসে তাঁরা নির্বিকারচিত্তে ব্যক্ত করতে পারেন তাঁদের আশ্চর্য নিরাসক্ত সব প্রতিক্রিয়া। আর এই ঘটনার পিছনে দোষটা কার, তাই নিয়ে শুরু হয় পারস্পরিক দোষারোপ ও নির্লজ্জ চাপান-উতোর।

কি তাঁদের সেই প্রতিক্রিয়া? না, তাঁদের মতে চারটি শিশুর মৃত্যুর মধ্যে কোনও অস্বাভাবিকতা নেই, এর সাথে বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কোনও সম্পর্ক নেই। অবশ্য এই স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে স্বাস্থ্যদপ্তরের এমনকি কোনও তদন্তেরও প্রয়োজন হয় নি। সোমবার রাতে স্বাস্থ্যসচিব কল্যাণ বাগচি ও স্বাস্থ্য (শিক্ষা) অধিকর্তা ডাঃ চিত্তরঞ্জন মাইতি হাসপাতালে গিয়ে কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলেই এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে যান এবং তারই ভিত্তিতে স্বাস্থ্যমন্ত্রী সূর্যকান্ত মিশ্র সহ স্বাস্থ্যদপ্তরের কর্তারা জানিয়ে দেন যে, চারটি শিশুর অবস্থাই আশঙ্কাজনক ছিল ও তাদের মৃত্যু স্বাভাবিক। বিদ্যুৎ বিভ্রাটের সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক? নৈব নৈব চ।

সাথে সাথে শুরু হয়ে গেছে বিদ্যুৎবিভ্রাটের কারণ নিয়েও চাপান-উতোর। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তো বিদ্যুৎ সরবরাহকারী সংস্থা সিইএসসি'র উপর দোষ চাপিয়ে খালাস। আর সিইএসসি জানিয়ে দিয়েছে, ট্রাম কোম্পানি নিজেদের বিদ্যুতের খুঁটি পুঁততে গিয়ে লাইন ট্রিপ করে ফেলায় এই বিপত্তি। অতএব তারা ঝাড়া হাত-পা। আর ট্রাম কোম্পানির প্রতিক্রিয়া আরও অভাবনীয়। তাঁদের কর্তাব্যক্তিরা জানিয়েছেন যে, এরকম কোনও ঘটনার কথা তাঁদের জানাই নেই। জানলে ব্যবস্থা নেবেন।

অথচ বাস্তব ঘটনা কি? টানা দেড় ঘণ্টা বিদ্যুৎ না থাকার কারণে হাসপাতালে যে অসহনীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল তা সুস্থ বয়স্ক লোকেদেরই অসুস্থ করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট। সেখানে অসুস্থ সদ্যোজাত শিশুদের যে কি অবস্থা হতে পারে তা সহজেই বোধগম্য। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মতে বিদ্যুৎ বিভ্রাটের ফলে অন্তত দু'টি কারণে শিশুমৃত্যুর সম্ভাবনা প্রবল। প্রথমত, অন্ধকারে ভয় পেয়ে শিশুরা কাঁদতে শুরু করলে অক্সিজেনের ঘাটতি হয়। শ্বাসকষ্টজনিত রোগে আক্রান্ত শিশুদের

আটের পাতায় দেখুন

প্রবীণ পার্টি সংগঠকের জীবনাবসান

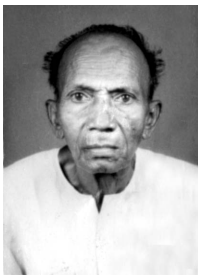

ঝাড়খণ্ড রাজ্যের সিংভূম জেলার পোটকা ব্লকের প্রবীণ পার্টি সংগঠক কমরেড রোহিণী পাত্র গত ২০ আগস্ট শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। ১০ সেপ্টেম্বর পোটকা ব্লকের মানপুর বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার প্রধান বক্তা এস ইউ সি আই ঝাড়খণ্ড রাজ্য কমিটি ও সিংভূম জেলা কমিটির সদস্য কমরেড বিমল দাস প্রয়াত কমরেডের প্রতিকৃতিতে মাল্যার্পণ করে শ্রদ্ধা জানান। এরপরে এস ইউ সি আই ব্লক কমিটির পক্ষ থেকে কমরেড ধীরেন ভকত, এ আই এম এস এস-এর পক্ষ থেকে কমরেড খোকী মাহাতো, এ আই কে কে এম এস-এর পক্ষ থেকে কমরেড শৈলেন মুন্ডা, সিংভূম জেলা কমিটির পক্ষ থেকে কমরেড সুমিত রায়, এ আই ডি এস ও'র পক্ষ থেকে কমরেড উমাকান্ত পাত্র, কমরেড কমলিনী সরদার, কমরেড উপাসিনী সরদার, ডাঃ রেবিকা জ্যোতিষী, অজিত চ্যাটার্জী, নাগেশ্বর ধল, খাসীরাম পাত্র, শিশির পাত্র, নুনু রজক, করণ হেমব্রম প্রয়াত কমরেডের প্রতি পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেন।

কমরেড বিমল দাস বলেন, প্রয়াত কমরেড রোহিণী পাত্র মোসাবনী খনিতে কার্যরত অবস্থায় এ যুগের মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের সহযোদ্ধা কমরেড হীরেন সরকারের সান্নিধ্যে আসেন এবং কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দলের সাথে যুক্ত হন এবং সেই এলাকায় সংগঠন গড়ে তোলার কাজ শুরু করেন। পরে শারীরিক অসুস্থতার জন্য তিনি চাকরি ছেড়ে দেন এবং নিজ গ্রাম মানপুরে এসে মানপুর, কালিকাপুর অঞ্চলে দলের কাজকর্ম শুরু করেন এবং সংগঠন গড়ে তোলেন। পার্টি কমরেডদের প্রতি ছিল তাঁর অফুরন্ত ভালবাসা। তিনি অনেক দুঃখ কষ্টের মধ্যে জীবনযাপন করেছেন। অন্যায় দেখলে তিনি সহ্য করতে পারতেন না, একা হলেও প্রতিবাদ করতেন। শরীর অসুস্থ থাকার সময়েও তিনি পার্টির কাজকর্মের খোঁজখবর নিতেন, দলের পত্রিকা এবং শিবদাস ঘোষের বই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তেন। তাঁর জানার আগ্রহ ছিল প্রবল। মানুষের সাথে তিনি দলের রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করতেন। নতুন কমরেডদের আরো এগিয়ে যাবার জন্য উৎসাহ তৈরি করে দিতেন। প্রয়াত কমরেড রোহিণী পাত্রের জীবনসংগ্রাম ও চরিত্র থেকে শিক্ষা নিয়ে পার্টি সংগঠনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে — এটাই হবে প্রয়াত কমরেডদের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন কমরেড ধীরেন ভকত, খোকী মাহাতো, নীরেন কুমার ভকত, নাগেশ্বর ধল, বীরেন্দ্র দেও। সভাপতিত্ব করেন আপতী মুন্ডা।

কমরেড রোহিণী পাত্র লাল সেলাম

দিল্লিতে বিশাল ছাত্রমিছিল

একের পাতার পর

দিল্লির এই সংসদ অভিযান। গত দু'মাস ধরে রাজ্যে রাজ্যে শিক্ষায় ফি বৃদ্ধি, ক্যাপিটেশন ফি, ডোনেশন ও ভর্তি সমস্যা নিয়ে স্কুল স্তর থেকে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্তর থেকে রাজ্য স্তরে ছাত্র আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। দিল্লির সংসদ অভিযানের প্রস্তুতিতে এক মাস ধরে দিল্লি ও সন্নিহিত রাজ্যগুলিতে ডি এস ও'র স্বেচ্ছাসেবক ও সংগঠকরা নিরলস পরিশ্রম করে স্কুল-কলেজে ঘুরে ঘুরে ছাত্রসমাজের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা জাগায় এবং আন্দোলনমুখী মানসিকতা সৃষ্টি করে।

বরোদার এম এফ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রামী ছাত্ররা, পাঞ্জাবের পাতিয়ালা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা, যারা সালসা-রোপার-মোহালি-চন্ডীগড়ে দু'বছর ধরে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে রাজ্য সরকারকে বাধ্য করেছে বর্ধিত ফি প্রত্যাহার করতে, তারা ও তাদের সাথে বিভিন্ন কলেজ থেকে শত শত ছাত্র এসেছে বিক্ষোভ সমাবেশে। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়, কানপুর, জৌনপুর, মোরাদাবাদ সহ উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন প্রান্তের স্কুল-কলেজ থেকে এসেছে শত শত ছাত্রছাত্রী লড়াইয়ের দৃঢ় সংকল্প বুকে নিয়ে। মধ্যপ্রদেশের সাগর, ভোপাল, জবলপুর, গুণা, গোয়ালিয়র থেকেও এসেছে দলে দলে ছাত্রছাত্রী; এসেছে নাগপুর, দুর্গ, ভিলাই ও দণ্ডকারণ্য থেকেও।

১৯৮৬ সালে কেন্দ্রে যখন কংগ্রেস সরকার, তখন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর নেতৃত্বে 'জাতীয় শিক্ষানীতি'র যে রূপরেখা তৈরি হয়েছিল, তাতেই শিক্ষায় সরকারের আর্থিক দায়দায়িত্ব অস্বীকার করার মধ্য দিয়ে কংগ্রেসই শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণের সিংহদরজা খুলে দিয়েছিল, মূল্যবোধভিত্তিক শিক্ষার নামে ধর্মীয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন নানা বিষয় সিলেবাসে ঢুকিয়েছিল। কংগ্রেসের দেখানো সেই পথেই বিজেপি সরকার হেঁটেছে আরও দ্রুতগতিতে। সেদিন কংগ্রেস প্রবর্তিত জাতীয় শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে দেশজুড়ে আন্দোলন গড়ে তুলেছিল এ আই ডি এস ও। আজ সেই কংগ্রেসেরই নেতৃত্বে সিপিএমের সমর্থনে কেন্দ্রে নতুন ইউপিএ সরকার বসেছে।

কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী অর্জুন সিং-এর সাথে আলোচনা করছেন এ আই ডি এস ও'র নেতৃবৃন্দ

তাই, গত ১ মাস ধরে প্রচারের সময় দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়, জে এন ইউ বা জামিয়া মিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় বা হরিয়ানার রোহতক বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে এ আই ডি এস ও'র কর্মীরা ছাত্রদের বোঝাতে চেয়েছে, তথাকথিত বামপন্থী ছাত্রসংগঠন এস এফ আই বা এ আই এস এফ ছাত্রদের বিভ্রান্ত করার যে চেষ্টাই করুক না কেন, দেশের পুঁজিপতিশ্রেণীর বিশ্বস্ত সেবাদাস কংগ্রেস ও তার সহযোগীদের কাছ থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রগতিমুখী পদক্ষেপ আশা করা যায় না। যদি ছাত্রস্বার্থে, শিক্ষাস্বার্থে ন্যায্য দাবি আদায় করতে হয়, তবে তা একমাত্র দুর্বার সংগঠিত ছাত্র আন্দোলনের দ্বারাই সম্ভব। তাই এ আই ডি এস ও ছাত্র আন্দোলন গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর।

কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী অর্জুন সিং-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে দাবিপত্র পেশ করার জন্য সময় চেয়ে গত জুন মাস থেকে কয়েকবার মন্ত্রীর কাছে চিঠি পাঠানো হয়েছিল। তার জবাব দেওয়ার সৌজন্যটুকুও মন্ত্রী দেখান নি। কিন্তু ছাত্র অভিযানের প্রচার ও প্রস্তুতি যত এগিয়েছে, দিল্লি ও পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলিতে ছাত্রকর্মীদের নিরলস প্রচার ও সাংগঠনিক কার্যকলাপের ফলে ছাত্রসমাজের মধ্যে যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল, তার আঁচ পেয়ে পুলিশ বিভাগ নড়ে বসে, মন্ত্রীরও টনক নড়ে। ২৪ সেপ্টেম্বর সকাল ১১টায় মন্ত্রী সাক্ষাতের সময় দেন। এ আই ডি এস ও সভাপতি কমরেড প্রতাপ সামল ও সাধারণ সম্পাদক কমরেড দেবাশীষ রায়ের নেতৃত্বে ৬ জন ছাত্রনেতার এক প্রতিনিধি দল মন্ত্রীর সাথে দেখা করে দাবিপত্র নিয়ে আলোচনা করেন। মন্ত্রী অর্জুন সিং আশ্বাস দিয়েছেন যে, ক্যাপিটেশন ফি সংক্রান্ত সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশ বাতিল করাবার জন্য সংসদের আগামী অধিবেশনেই তাঁরা বিল আনবেন। এছাড়া, জাতীয় শিক্ষানীতি 'রিভিউ' করার জন্য যে কমিটি হয়েছে, সেখানে ডিএসও'র পক্ষ থেকে সংশোধনী বা সংযোজনী দেওয়া হলে, তা গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হবে।

বেলা ১১-৩০ নাগাদ রামলীলা ময়দান থেকে দশ সহস্রাধিক ছাত্রছাত্রীর সুশৃঙ্খল সুসজ্জিত বিশাল মিছিল শুরু হয়। মিছিলের সামনে ছিলেন সর্বভারতীয় ছাত্র নেতৃবৃন্দ। মিছিলে সহস্রকণ্ঠের স্লোগান ওঠে, 'ক্যাপিটেশন ফি ব্যবস্থা বাতিল কর', 'শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ করা চলবে না', 'শিক্ষার আর্থিক দায়িত্ব সরকারকে বহন করতে হবে', 'শিক্ষায় জ্যোতিষশাস্ত্র সহ কুসংস্কারের শিক্ষা চালু করা চলবে না।' মিছিল এগিয়ে চলে দিল্লির চওড়া রাজপথ ধরে সংসদ অভিমুখে। কেন্দ্রে নতুন ইউপিএ সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর দিল্লির বুকে এটাই সর্বভারতীয় প্রথম ছাত্রবিক্ষোভ মিছিল।

সংসদমার্গের ছাত্র সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কমরেড প্রতাপ সামল, দেবাশিষ রায় ও অন্যান্য রাজ্যের ছাত্র নেতারা। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন হরিয়ানা রাজ্য শাখার সভাপতি কমরেড ওমপ্রকাশ। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন কমরেডস্ বালেন্দ্র কাটিয়ার (উত্তরপ্রদেশ), দীপক কুমার (বিহার), রাজু শর্মা (রাজস্থান), মনজিৎ সিং (পাঞ্জাব), প্রকাশ দেবী (দিল্লি), মুকেশ সেমবল (গুজরাট), প্রমোদ কাম্বলে (মহারাষ্ট্র), বিশ্বজিৎ হারোড়ে (ছত্তিশগড়), রামঅবতার সিং (মধ্যপ্রদেশ) ও রমেশ (হরিয়ানা)। ছাত্র নেতারা বলেন, দাবি না আদায় হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে এবং আন্দোলন আরও তীব্র করা হবে।

ক্যাপিটেশন ফি

একের পাতার পর

বেতন অনেকখানি কমাতে ও বর্ধিত হোস্টেল চার্জ প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়।

গত বছরেই তারা জয়েন্ট এন্ট্রান্সের মেধা তালিকার ছাত্রছাত্রীদের বঞ্চিত করে কেবল টাকার জোর যাদের আছে তেমন ১০৫ জনকে ছাত্রপ্রতি ৯,২৪০০০ টাকা নিয়ে এসএসকেএম এবং মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজে ভর্তি করে। গরিব ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের মেধাবী ছাত্রদের এইভাবে মেডিকেল শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করার বিরুদ্ধে আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করার জন্য এ আই ডি এস ও মেডিকেল ইউনিটের পক্ষে ডাঃ মৃদুল সরকার ও ডাঃ চন্দন মণ্ডল আহ্বান জানিয়েছেন।

ভারতে পেট্রোপণ্যের দাম এত বেশি কেন

একের পাতার পর

আমাদের দেশে তেলের দাম প্রায় তার ডবল? — এ সব প্রশ্নের কী উত্তর সরকার দেবে?

কেন আমাদের দেশ আমদানি নির্ভর

একথা সত্য, আমাদের দেশ তেলের ক্ষেত্রে ক্রমাগত আমদানি নির্ভর হয়ে পড়ছে। অথচ, '৭০-এর দশকের শেষের দিকে প্রয়োজনীয় তেলের ৭০ শতাংশ এদেশেই উৎপন্ন হতো। বর্তমানে উৎপন্ন হয় মাত্র ৩০ শতাংশ। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ২০১০ সালে উৎপন্ন হবে মাত্র ১৪ শতাংশ। অর্থাৎ দেশের প্রয়োজনীয় তেলের চাহিদার তুলনায় শতাংশের হারে আভ্যন্তরীণ উৎপাদন ক্রমাগত কমছে ও কমবে এবং আমদানি-নির্ভরতা বাড়ছে ও বাড়বে। কেন এমন হলো? এরকম তো হওয়ার কথা ছিল না! এর রহস্য কী? এর উত্তর আমাদের খুঁজতে হবে একচেটিয়া পুঁজির সেবাদাস সরকারগুলোর গৃহীত নীতির মধ্যে।

স্বাধীনতার পরেও আমাদের দেশের তেলশিল্প ছিল বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানির দখলে। এইসব বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানি তখন এদেশে নতুন নতুন তেলক্ষেত্র খুঁজে বের করার ব্যাপারে পুঁজি বিনিয়োগে একেবারেই উৎসাহী ছিল না, কারণ তাতে অতি দ্রুত উচ্চহারে মুনাফা ঘরে আসবে না এবং বিনিয়োগ করলেই নতুন তৈলক্ষেত্র খুঁজে পাওয়া যাবে এমন কোন নিশ্চয়তা সে সময়ে ছিল না। তাই অনিশ্চিত পথে না হেঁটে ঐ সব বহুজাতিক তেল কোম্পানি বিদেশ থেকে তেল আমদানি করে এদেশে বিক্রি করত।

১৯৭০ সালে বিদেশি বহুজাতিক তেল কোম্পানিগুলির ব্যবসা এদেশে বন্ধ করে দেওয়া হয়, সাথে সাথে ও এন জি সি'র (অয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস কমিশন) কাজকে সম্প্রসারিত করা হয়। এরপর রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে নতুন নতুন তৈলক্ষেত্র খুঁজে বের করা হয় ও সেখান থেকে তেল উত্তোলন শুরু হয়। প্রায় সম্পূর্ণ আমদানিনির্ভর এ দেশ তেলের ক্ষেত্রে প্রায় স্বয়ম্ভর হয়ে ওঠে, দেশের প্রয়োজনীয় ১০০ শতাংশ তেলই শোধন করার ক্ষমতা অর্জন করে।

কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন হতে শুরু করে '৮৫ সালের পর। এই সময় রাজীব গান্ধীর সরকারের নেতৃত্বে তথাকথিত অর্থনৈতিক সংস্কার শুরু হয়, যা আরও গতিবেগ অর্জন করে সিপিএম-বিজেপি সমর্থিত ভি পি সিং সরকারের আমলে। অবশেষে ১৯৯১ সালের জুলাই মাসে এই পরিবর্তন চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করে। তদানীন্তন কংগ্রেস সরকারের আমলে 'নয়া আর্থিক নীতি' গৃহীত হয়। উন্নয়ন ও আর্থিক পুনরুজ্জীবনের নামে এই কংগ্রেস সরকার লাভজনক সমস্ত শিল্প ও ক্ষেত্রগুলি দেশি বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানির হাতে তুলে দিতে থাকে। সিপিএম সমর্থিত দু'দফার যুক্তফ্রন্ট সরকারও একই কাজ করেছে। ফলে দেখা যায় বেসরকারীকরণের নিরবচ্ছিন্ন এই নীতির ফলে ১৯৯৬ সালেই ২৩টি তেল উৎপাদনকারী ব্লক দেশি বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এর সাথে যুক্ত হয় ও এন জি সি এবং অয়েল ইন্ডিয়াকে দুর্বল করে ফেলার কৌশলী পরিকল্পনা। যার ফলে তেল অনুসন্ধান ও তেল শোধন করার ব্যবস্থায় শ্লথতা দেখা দিল। (Instrument for exploration and refining of oil has tended to slow down'', EPW, 20-7-97) '৯৬ সালে নতুন তৈলক্ষেত্র খুঁজে বের করার ক্ষেত্রে সরকারি অর্থ বরাদ্দ ১১০০ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়। এইসব পরিকল্পনা ও অন্য কয়েকটি বিষয় যুক্ত হয়ে দেশের আভ্যন্তরীণ তেল উৎপাদন কমে যেতে থাকে। দেখা যায়, ৯৫-৯৬ সালে যেখানে এদেশে মোট অশোধিত তেল উৎপাদন হয়েছিল ৩৪.৫২ মিলিয়ন মেট্রিক টন, ৯৬-৯৭ সালে তা হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৩১.৫৪ মিলিয়ন মেট্রিক টন। ২০০৩ সালে এর পরিমাণ ছিল ৩১ লক্ষ মেট্রিক টনের কাছাকাছি। অর্থাৎ বিগত ৮ বছরে আভ্যন্তরীণ তেলের উৎপাদন এক ফোঁটাও বাড়েনি। তার আগের বছরগুলির সাথে তুলনা করলে বলা চলে — 'বরং কমেছে'। এর প্রধান কারণ তেলক্ষেত্রকে (Oil Sector) দেশি-বিদেশি পুঁজির স্বার্থে পরিচালনা করা, যারা বেশি ও নিশ্চিত মুনাফার জন্য বিদেশ থেকে তেল কিনে এখানে বিক্রি করে। তাই বলা যায় অতি সুকৌশলে দেশি-বিদেশি পুঁজির স্বার্থে দেশকে আমদানি নির্ভর করে ফেলা হয়েছে এবং তা করেছে নানাবর্ণের শাসক রাজনৈতিক দল ও তাদের পরিচালিত সরকারগুলোই। এই হল তেলের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের আমদানিনির্ভর হয়ে পড়ার ইতিহাস।

আমদানি নির্ভরতাই কি বর্তমান মূল্যবৃদ্ধির মূল কারণ?

আমদানি নির্ভরতার জন্যই কি তেলের দাম বাড়ছে? এই প্রশ্নের একমাত্র উত্তর হল — না। আশ্চর্য মনে হলেও এটাই সত্য। যে কেউ প্রশ্ন করতে পারেন — এটা কী করে সম্ভব? দেশের উৎপাদিত তেলের উৎপাদন খরচ যখন আমদানি করা তেলের দামের অর্ধেক বা কখনও কখনও অর্ধেকের কম, তখন আমদানি নির্ভরতা কমলে তো দেশে তেলের দাম কমে যাওয়াই স্বাভাবিক। আমরাও মনে করি, তাই হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু বর্তমানে আর তা হবে না; কারণ, কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহীত নীতি। এই নীতির নাম হল ''ইম্পোর্ট প্রাইস প্যারিটি'', অর্থাৎ আমদানি মূল্যের সমান দাম। এই নীতি কেন্দ্রীয় সরকার নিয়েছে কেন? কারণ এর ফলে লাভবান হবে রিলায়েন্স, ইন্ডিয়ান অয়েলের মতো সরকারি বেসরকারি একচেটিয়া কোম্পানি। কেবল বিদেশি পুঁজিই নয়, ভারতীয় মাল্টিন্যাশানাল তেল কোম্পানিগুলিরও চাপ ছিল ''ইম্পোর্ট প্রাইস প্যারিটি'' চালু করার, যাতে দেশের তৈল সম্পদ ও কম উৎপাদন খরচের সুযোগ নিয়ে কম খরচে তেল তৈরি করে, আমদানি করা তেলের দামে বেচে তারা প্রভূত মুনাফা করতে পারে, যেটা তারা করছেও। এই দেশিবিদেশি মাল্টি-ন্যাশানালদের স্বার্থেই কেন্দ্রীয় সরকার 'ইম্পোর্ট প্রাইস প্যারিটি' চালু করেছে। অর্থাৎ দেশে উৎপাদিত তেলের খরচ যত কম হোক তা দেশের মধ্যেও বিক্রি করা হবে আমদানি করা তেলের সমান দামে। ফলে এখন আর দেশি তেল ও বিদেশি তেলের মধ্যে দামের ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য নেই। কেন্দ্রের এই নীতির ফলে রিলায়েন্সের মতো দেশিয় একচেটে পুঁজি তেলের ব্যবসায়ে বিপুল মুনাফা করার সুযোগ পেয়েছে। যদি কোনদিন আমাদের প্রয়োজনীয় তেলের ৯৫ শতাংশও এদেশে উৎপন্ন হয়, আমদানি নির্ভরতা একেবারেই না থাকে, তা হলেও দেশিয় তেলের উৎপাদন খরচ কম হওয়া সত্ত্বেও বাজারে তেলের দাম কমার সম্ভাবনা নেই। ভারতীয় তেল কোম্পানিগুলি আন্তর্জাতিক বাজারের বর্ধিত দামেই তা বিক্রি করে মুনাফা করবে। 'তেলের দাম এভাবে বৃদ্ধি করা চলবে না' বলে হুংকার ছেড়ে যে সিপিএম জনস্বার্থের চ্যাম্পিয়ন সাজতে চাইছে — তারা কিন্তু এই একচেটিয়া মালিকদের স্বার্থে চালু করা 'ইম্পোর্ট প্রাইস প্যারিটি' নীতি প্রত্যাহারের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে একটা অনুরোধও করেনি। তাদের বহুঘোষিত অভিন্ন কর্মসূচিতে এই নীতির বিরুদ্ধে একটা শব্দও নেই।

তেল তহবিলের টাকা আত্মসাৎ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার

আমাদের দেশের তেল তহবিলের জন্ম ১৯৭৫ সালে। এই তহবিলের উদ্দেশ্য ছিল দুটো। এক, সমগ্র দেশে একটা দামে তেল ও তেলজাত দ্রব্য সরবরাহ করা (স্থানীয় লেভি ও সারচার্জ — যা রাজ্য সরকার ধার্য করে থাকে — সেগুলি বাদ দিয়ে)। দুই, পেট্রল ও গ্যাসোলিন লাভজনক দামে বিক্রি করে সেই টাকায় ডিজেল, কেরোসিন ও রান্নার গ্যাসে খানিকটা ভর্তুকি দেওয়া। ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত এই তহবিল সবসময়ই উদ্বৃত্ত ছিল। এই উদ্বৃত্তের পরিমাণ ছিল ৮৯০০ কোটি টাকা (যা সুদে আসলে বর্তমানে প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকার কাছাকাছি)। সিপিএম সমর্থিত ভি পি সিং সরকার নানা অজুহাতে হিসাবের কারচুপি করে বাজেট ঘাটতি মেটানোর কাজে একে ব্যবহার করেছে। তেল তহবিলের টাকা আত্মসাতের এই ছিল শুরু।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। ১৯৭৫ সাল থেকেই তেল শিল্পের বিকাশের নাম করে কেন্দ্রীয় সরকার দেশে উৎপাদিত তেলের উপর বিশেষ ধরনের একটা সেস বসাতে শুরু করে (দু'হাজার দু সালের মার্চ মাস থেকে এই সেসের পরিমাণ টন প্রতি ১৮০০ টাকা)। এ পর্যন্ত বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সরকার এই খাতে যে টাকা আদায় করেছে সুদে আসলে তার পরিমাণ হল কমবেশি এক লক্ষ কোটি টাকা। কিন্তু এ পর্যন্ত তেলশিল্পের উন্নয়নে খরচ করা হয়েছে মাত্র ৯০২ কোটি টাকা। এবং সব থেকে আশ্চর্যের কথা, ১৯৮৩-৮৪ থেকে ৮৭-৮৮ এবং ১৯৯২-৯৩ সাল থেকে বর্তমান বছর পর্যন্ত তেলশিল্পের উন্নয়নে এই খাত থেকে একটা টাকাও খরচ করা হয়নি। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকার সমস্ত বিধিবিধান লঙ্ঘন করে প্রায় ৯৯ হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছে। এবং এই কাজ কংগ্রেস সিপিএম সমর্থিত যুক্তফ্রন্ট এবং বিজেপি-তৃণমূল জোট সরকার — সবাই করেছে। ২০০২-০৩ সালে এ দেশের তেল আমদানির খরচ ছিল ৮৫,০৪২ কোটি টাকা। ২০০৩-০৪ সালে তার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৯৩,১৫৯ কোটি টাকা। অর্থাৎ তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে ১ বছরে খরচ বৃদ্ধির পরিমাণ ৮,১১৭ কোটি টাকা। অতি সহজেই এই টাকা তেল তহবিল থেকে মিটিয়ে দেওয়া যেত এবং মিটিয়ে দেওয়ার পরও তেল তহবিলে আরও ৯১ হাজার কোটি টাকা থাকত। তাহলে সত্যিই কি বারবার তেলের এই মূল্যবৃদ্ধি করার প্রয়োজন হত? আন্তর্জাতিক মূল্যবৃদ্ধির কথা তুলে যাঁরা বলছেন — 'সরকার নিরুপায়, সরকারের কিছু করার নেই' — তাঁরা সত্যের অপলাপ করছেন নাকি?

দামবৃদ্ধিতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের ভূমিকা

আন্তর্জাতিক বাজারের দামবৃদ্ধি ছাড়াও তেলের দাম আকাশছোঁয়া হওয়ার ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কর নীতির ভূমিকাও অনেকখানি। এবার সে প্রসঙ্গ দেখা যাক। আন্তর্জাতিক বাজারে যে দামবৃদ্ধি নিয়ে এত হইচই করা হয় — সেই দাম প্রকৃতপক্ষে কত? জুন, ২০০৪ সাল পর্যন্ত সর্বোচ্চ দাম ছিল ব্যারেল প্রতি (১ ব্যারেল = ১৫৮.৬ লিটার) ৩৫ ডলার (১ ডলার = ৪৫.৪৬ টাকার কাছাকাছি)। তারপর থেকে এই দাম বাড়তে বাড়তে এই লেখার সময় ৪২ ডলারে এসে দাঁড়িয়েছে। এই দামকে যদি আমরা হিসাবে ধরি তাহলে ১ লিটার অশোধিত তেলের দাম দাঁড়ায় প্রায় ১২ টাকা ২৫ পয়সা। পশ্চিম এশিয়া থেকে মুম্বাই বন্দর পর্যন্ত পরিবহন খরচ ব্যারেল প্রতি ১.২৮ ডলার। শোধনের খরচ ব্যারেল প্রতি ১.৫০ ডলার (মনে রাখতে হবে এদেশে শোধনের খরচ আন্তর্জাতিক বাজারের অর্ধেক বা কখনও কখনও তারও কম)। তাহলে পরিবহন ও শোধনের জন্য খরচ দাঁড়ায় ব্যারেল প্রতি সর্বমোট ২.৭৮ ডলার। অর্থাৎ লিটার প্রতি মাত্র ৮০ পয়সা। সুতরাং আন্তর্জাতিক বাজারে ৪২ ডলার ব্যারেল দরে তেল কিনে পরিবহন ও শোধন করে ভারতে শোধিত তেলের দাম দাঁড়ায় ১২.২৫ + .৮০ = ১৩.০৫ টাকা লিটার। এর উপর যুক্ত হবে ২০ শতাংশ হারে আমদানি শুল্ক অর্থাৎ আরও ২.৫০ টাকা, অর্থাৎ প্রতি লিটার সর্বমোট ১৫.৫৫ টাকা। মনে রাখতে হবে, এই যে লিটার প্রতি ২.৫০ আমদানি শুল্ক আমাদের দিতে হচ্ছে তা কিন্তু সরকারি কোষাগারে জমা পড়ে না। এই টাকা দিয়ে তেলশিল্পের মালিকদের ভরতুকি দেওয়ার নামে পকেট ভরানো হয়। এই তহবিল থেকে গত বছর রিলায়েন্স কোম্পানিকে সরাসরি দেওয়া হয়েছে ২০০০ কোটি টাকা।

প্রতি লিটার পেট্রলের আমদানি খরচ (১ ব্যারেল = ৪২ ডলার)

তাহলে প্রতি লিটার পেট্রলের আমদানি খরচ কত? দেখা গেল—

অশোধিত তেল	১২.২৫ টাকা
পরিবহন খরচ	০.৩৭ পয়সা
শোধন খরচ	০.৪৩ পয়সা
আমদানি শুল্ক	২.৫০
মোট	১৫.৫৫ টাকা

অর্থাৎ আন্তর্জাতিক বাজারদরের সর্বোচ্চ দামে তেল কিনে শোধন ও পরিবহন খরচ ধরে এক লিটার পেট্রলের দাম পড়তে পারে (আমদানি শুল্ক বাদ দিয়ে) বড় জোর ১৩.০৫ টাকা। অথচ এই তেলই আমাদের বাজার থেকে কিনতে হয় ৩৯.৯১ টাকায়। তাহলে এই দামবৃদ্ধির কারণ কী? কেন লিটার প্রতি বাড়তি আরও ২৬.৮৬ টাকা আমাদের নগদ গুণে দিতে হয়? এর একটাই উত্তর — আমদানি শুল্ক ছাড়াও পেট্রল ডিজেল দুইয়ের ওপরে রয়েছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কর। অর্থাৎ তেলের দামের থেকে এদের বসানো মিলিত কর দ্বিগুণেরও বেশি। তাই কোন দ্বিধা না রেখেই এটা পরিষ্কার বলে দেওয়া যায় তেলের এই অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির জন্য দায়ী কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী কর নীতি।

কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন বিভিন্ন বুর্জোয়া দল এই ধরনের করের বোঝা জনগণের ঘাড়ে চাপাবে এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কারণ, এটাই ওদের চরিত্র। ওদের এই চরিত্র বুঝতে সংগ্রামী সাধারণ মানুষের বিশেষ কোন অসুবিধা হয় না। কিন্তু অসুবিধা হয় সিপিএম এবং তার রাজ্য সরকারের ভূমিকা বুঝতে। কারণ, তাদের চরিত্র দ্বিমুখী। তেলের মূল্যবৃদ্ধি হলে তারা বিরোধিতার ভান করে, আবার সেই সুযোগে বিক্রয়করের বর্ধিত বোঝা মানুষের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে বাসভাড়া বাড়ানোর জন্য বাসমালিকদের সঙ্গে বৈঠকে বসে যায়। আমরা আগেই বলেছি — তেলশিল্পকে বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়া বা দেশে উৎপাদিত তেলের দাম আমদানিকৃত তেলের দামের সাথে এক করে দেওয়া ইত্যাদি প্রতিটি পদক্ষেপকেই সিপিএম কখনও নীরব থেকে কখনও বা নামমাত্র বিরোধিতা করে প্রকারান্তরে মূল্যবৃদ্ধি বাস্তবায়িত হতে সাহায্য করেছে। কিন্তু তাদের জনবিরোধী চরিত্রের এটুকুই সব নয়। **সিপিএম পরিচালিত ফ্রন্ট সরকার তেলের উপর বিক্রয় কর বসিয়েছে ২৫ শতাংশ, যা ভারতবর্ষের মধ্যে সব থেকে বেশি। পাশের রাজ্য আসামে এই করের হার ১২ শতাংশ, ঝাড়খণ্ডে ২০ শতাংশ।** অর্থাৎ, বুর্জোয়া দল পরিচালিত সরকার তেলের উপর যতটা বিক্রয় কর বসিয়েছে, 'প্রগতিশীল' সিপিএম সরকার বসিয়েছে তার থেকে অনেক বেশি। এর সাথে যুক্ত হয়েছে পেট্রল-ডিজেলের উপর রাজ্য সরকারের বসানো লিটার প্রতি ১ টাকা সেস। এর ফলে ঝাড়খণ্ড বা আসাম থেকে আমাদের রাজ্যে তেলের দাম লিটার প্রতি দু থেকে সাড়ে তিন টাকা বেশি। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গবাসী কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যুগপৎ আক্রমণে দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ তেলের দাম গুণে দিতে বাধ্য হচ্ছেন। সম্প্রতি দু'দফায় তেলের দাম

আটের পাতায় দেখুন

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06

R. No 5268 / 60

এস এফ আই-এর হাতে ছাত্রীর শ্লীলতাহানি

এ আই ডি এস ও'র ধিক্কার সভা

হুগলি ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির প্রথম বর্ষের এক ছাত্রীর উপর যৌন নিগ্রহের ঘটনা ঘটেছে। ঘটনাটি এতই ঘৃণ্য যে ছাত্রীটি প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানাতে গিয়ে সব কথা খুলে বলতে পারেনি। এই লজ্জাজনক ঘটনার জন্য ছাত্রীটি সরাসরি ঐ কলেজের এসএফআই ছাত্র সংসদের নেতাদের দায়ী করেছে। আরও দুঃখজনক হল এসএফআইয়ের ছাত্রী কর্মীদের আচরণ। তারা ঘটনার সময় শুধু উৎসাহই দেয়নি, খবরে প্রকাশ, এই নোংরামিতে সহায়তাই করেছে। সিপিএমের রাজনীতি আজ তাদের ছাত্রসংগঠনের কর্মীদের মধ্যেও কী চরম নৈতিক অধঃপতন ও অবক্ষয় সৃষ্টি করেছে এই ঘটনা তারই একটি জঘন্য নমুনা।

এই ঘটনায় অভিযুক্ত এসএফআই নেতাদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে এ আই ডি এস ও হুগলি জেলা কমিটির পক্ষ থেকে ২৯ সেপ্টেম্বর চুঁচুড়া ঘড়ির মোড়ে এক ধিক্কার সভা করা হয় এবং সেখান থেকে মিছিল করে জেলাশাসকের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ধিক্কার সভায় ডিএসও নেতারা বলেন, এসএফআই-এর ছাত্রী কর্মীরা মেয়ে হয়ে আরেকটি মেয়ের উপর যৌন নিগ্রহে উৎসাহ দিয়ে মহিলাদের মর্যাদাকে কোথায় নামালেন, তা ভেবে দেখেছেন কি? তাঁরা বলেন, এভাবেই এসএফআই পশ্চিমবাংলার কলেজে কলেজে বিরোধী সংগঠনের ছাত্রছাত্রীদের উপর নানাভাবে অত্যাচার চালায়, ভয় দেখায়, হয়রানি করে, মেয়েদের কলেজে এসে ছেলেরা হামলা চালায়, মেয়েদের বাড়ি বাড়ি হুমকি দেয় এবং এই প্রক্রিয়াতেই বিরোধী কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দিয়ে ইউনিয়ন দখল করে। একজন ছাত্রী যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরেই অপর ছাত্রছাত্রীদের হাতে যৌন নিগ্রহের শিকার হয়, তাহলে আমাদের দেশে সাধারণ মহিলাদের নিরাপত্তা কতটুকু? এই ঘটনা জেলার শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ছাত্রছাত্রী ও সাধারণ মানুষ কিছুতেই মেনে নিতে পারে না।

ডিএসও কর্মীরা যখন অপরাধীদের শাস্তির দাবিতে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও রেলওয়ে প্লাটফর্মে প্রচার করছিল, সেইসময় বহু ছাত্রছাত্রী ও সাধারণ নাগরিক এস এফ আই-এর বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েন ও ধিক্কার জানান। প্রবল জনবিক্ষোভের আঁচ পেয়েই এসএফআই-এর জেলা নেতারা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, ঐ কলেজের এসএফআই নেতারা এই ঘটনার জন্য দায়ী। ডিএসও'র পক্ষ থেকে কলেজে কলেজে সুস্থ পরিবেশ বজায় রাখতে ছাত্রসমাজ ও জনসাধারণকে সোচ্চার হওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে।

পরিচারিকা সমিতির শহীদ প্রীতিলতা দিবস পালন

হুগলি

২৪ সেপ্টেম্বর শহীদ প্রীতিলতা দিবসে সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির হুগলি জেলা শাখার পক্ষ থেকে বেগমপুর প্রাইমারি স্কুলে প্রীতিলতা দিবস পালন করা হয়। শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন সমিতির পক্ষ থেকে পূজা প্রামাণিক, সুষমা ভড়, সরস্বতী ভৌমিক, সাবিত্রী চৌরসিয়া ও আরও অনেকে। প্রীতিলতার ওপর রচিত গানটি পরিবেশন করেন প্রিয়াংকা সাউ। এদিন শহীদ প্রীতিলতার ব্যাজও পরানো হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির পক্ষে লিলি কুণ্ডু। শহীদ প্রীতিলতার উদ্দেশ্য এবং আদর্শকে বুকে বহন করে বর্তমানে সমস্ত রকম অন্যায়, অত্যাচার, শোষণ, জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

সোনারপুর

গত ২৪ সেপ্টেম্বর সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির পক্ষ থেকে সোনারপুর স্টেশনে অমর শহীদ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার স্মরণে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সুভাষগ্রাম, নরেন্দ্রপুর, চাঁদপুর ও সোনারপুরের বহু সংখ্যক পরিচারিকা অংশগ্রহণ করেন। শহীদবেদীতে মাল্যদান ও ব্যাজ পরিধানের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। স্বাধীনতার এত বছর পরেও খেটেখাওয়া মানুষের উপর অব্যাহত অত্যাচার-অবিচারের প্রতিকারে আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে সভায় বক্তব্য রাখেন রাধা মিত্র।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা

গত ২৯ সেপ্টেম্বর জয়নগরে সমিতির জেলা দপ্তরে শহীদ প্রীতিলতা স্মরণে এক প্রাণবন্ত আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সঙ্গীত পরিবেশন করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী কুমকুম সরকার। সভায় বক্তব্য রাখেন এম এস এস-এর জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যা সুজাতা ব্যানার্জী। তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রীতিলতার আত্মদান ও বিপ্লবীদের লড়াইয়ের ইতিহাস তুলে ধরেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন এম এস এস-এর জেলা সম্পাদিকা মাধবী প্রামাণিক এবং প্রায় দেড় শতাধিক উৎসাহী পরিচারিকা। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির সম্পাদিকা পুষ্প পাল। তিনি প্রীতিলতাদের জীবন সংগ্রাম থেকে শিক্ষা নিয়ে আজকের বাঁচার লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান।

উত্তর ২৪ পরগণা

খাদ্যের দাবিতে পঞ্চায়েত ঘেরাও

সেপ্টেম্বরের ৭ দিনের টানা বর্ষণে সর্বস্বান্ত শত শত কৃষক ও খেতমজুর উপযুক্ত ত্রাণ ও নষ্ট হওয়া ফসলের ক্ষতিপূরণের দাবিতে গত ২৪ সেপ্টেম্বর হাবড়াতে কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের নেতৃত্বে কুমড়া গ্রাম পঞ্চায়েত ঘেরাও করে। প্রবল বর্ষণে চারিদিক জলমগ্ন। পাকা আউস ধান, আমন ধান ও শত শত বিঘা জমির সব্জি অতি বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত। প্রান্তিক ও মাঝারি চাষীরা সব কিছু খুইয়ে পথে বসেছে। অনাহারক্লিষ্ট মানুষ বাঁচার তাগিদে গ্রাম পঞ্চায়েতে যায় তাদের দাবি জানাতে। আন্দোলনের প্রবল চাপে প্রধান ও বিডিও ঘোষণা করতে বাধ্য হন যে, মিড ডে মিল ও খেতমজুরদের কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্পে কাজ দেবেন। উল্লেখ্য, ইতিমধ্যে মিড-ডে মিলের খাবার বিতরণ শুরু হয়েছে, ফুড ফর ওয়ার্কের কিছু কাজ দেওয়া হয়েছে। আন্দোলনের জয়ে দুর্গত মানুষের মধ্যে প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে।

শিশুমৃত্যুও মন্ত্রীদের বিচলিত করে না

ছয়ের পাতার পর

এক্ষেত্রে তীব্র অক্সিজেন ঘাটতিতে ভোগার সম্ভাবনা দেখা দেয়। এই অবস্থায় অন্ধকার হওয়ার সাথে সাথে অক্সিজেন দেওয়ার ব্যবস্থা করা না গেলে শিশুমৃত্যু ঘটতে পারে। দ্বিতীয়ত, সদ্যোজাত শিশুদের মৃত্যুর বড় কারণ হচ্ছে 'হাইপোথার্মিয়া'। এতে শরীরের তাপ বেরিয়ে যায়। এটা আটকানোর জন্য সেই শিশুদের 'রেডিয়েন্ট ওয়াটারের' মধ্যে রাখতে হয়। বিদ্যুৎ বিভ্রাটের জন্য ওয়াটার অচল হয়ে পড়লে শিশুমৃত্যু ঘটবেই। অথচ, এতদ্‌সত্ত্বেও কোনরকম তদন্ত না করেই স্বাস্থ্য দপ্তরের রায় — 'বিদ্যুৎ বিভ্রাটের সাথে শিশুমৃত্যুর কোনও সম্পর্কই নেই।' এটা কি যেনতেন প্রকারে নিজেদের গাফিলতি ঢাকা দেওয়ার প্রয়াসই নয়? ইতিপূর্বে এই হাসপাতালেই নিজেদের অপদার্থতায় শিশুমৃত্যুর ঘটনাকে আড়াল করতে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, এ তো স্বাভাবিক মৃত্যু। আমলাশোল ও দার্জিলিং চা বাগানে মানুষের অনাহারে মৃত্যুকে ওরা বলেন, অনাহার নয়, অপুষ্টি বা অন্যান্য কারণে মৃত্যু হয়েছে। মহিলা ধর্ষিতা হলে ওরা অপরাধীদের দোষ হালকা করতে ধর্ষিতা মহিলার উপরেই দোষ চাপান। বলেন, মহিলার চরিত্র খারাপ ছিল। নিজেদের অপদার্থতা অকর্মন্যতা ঢাকবার এ এক নির্লজ্জ অপকৌশল।

এখন প্রশ্ন তো উঠবেই। হাসপাতালের মত এরকম জরুরী পরিষেবা ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ সরবরাহের কোনও বিকল্প ব্যবস্থা রাখা হয়নি কেন? এই প্রশ্নের জবাবে স্বাস্থ্যমন্ত্রী সূর্যকান্ত মিশ্র, এ ব্যাপারে এখনই ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিলেও খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ২৯ সেপ্টেম্বর বুধবার পর্যন্ত হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বা স্বাস্থ্যদপ্তরের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে সিইএসসি'র সাথে কোনরূপ যোগাযোগই করা হয়নি। অর্থাৎ সরকারি দপ্তরের আর পাঁচটা গতানুগতিকতার পথে এই প্রতিশ্রুতিও ধামাচাপা পড়ার দিকে হাঁটতে শুরু করেছে।

আর এখানেই এসে পড়ে এক গভীরতর প্রশ্ন। সদ্য সন্তানহারা সাধারণ বাবা-মায়ের বুকফাটা কান্না এই সরকার ও প্রশাসনের বধির কানে আদৌ প্রবেশ করবে তো? নাকি তাঁরা মাটির পৃথিবী থেকে অনেক উপরের কোনও গজদন্ত মিনারের বাসিন্দা, যেখানে মাটির কাছাকাছি মানুষজনের দুঃখ-ব্যথা-বেদনাজনিত কান্নার ক্ষীণতম আর্তস্বরের কোনও প্রবেশাধিকার নেই। শুধু যখন কোনও ব্যাপারে খুব হইচই হয়, তখন তড়িঘড়ি কিছু প্রতিশ্রুতি বর্ষণ করে, কিছু তদন্ত কমিটি গঠন করে, কখনও বা চরম অবজ্ঞায় এমনকি সে পথও না মাড়িয়ে, সবকিছু চাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। তাই এতবড় একটা হৃদয়বিদারক ঘটনায়ও তাদের প্রতিক্রিয়ায় থাকে না লেশমাত্র আন্তরিকতার কোনো ছোঁয়া। আর আশ্চর্য পরিহাস হল এই যে, এরাই আবার ঢাক পেটায় — এই প্রশাসন, এই সরকার নাকি সংবেদনশীল, গরিব ও সাধারণ মানুষের বন্ধু!

গণবিক্ষোভ

২৭ সেপ্টেম্বর রাত ৩টা থেকে ভোর ৫-৩০মিঃ পর্যন্ত নারকেলডাঙ্গায় বিধানচন্দ্র রায় শিশু হাসপাতালে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকায় ভয়াবহ পরিস্থিতির সংবাদ পাওয়ামাত্র ভোর সাড়ে চারটেতেই ছুটে আসেন এস ইউ সি আই কাঁকুড়গাছি আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক এবং হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির আঞ্চলিক শাখার সভাপতি কমরেড অজয় চক্রবর্তী। ইতিমধ্যে মৃত শিশুদের আতঙ্কিত অভিভাবক, আত্মীয়স্বজন ও স্থানীয় মানুষ জড়ো হয়েছেন হাসপাতাল চত্বরে। কর্তৃপক্ষের চূড়ান্ত গাফিলতির প্রতিবাদে ক্ষোভে ফেটে পড়ে তাঁরা কমরেড অজয় চক্রবর্তীর নেতৃত্বে নারকেলডাঙ্গা মেন রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। পুলিশ এসে বিক্ষোভকারীদের উপর নৃশংসভাবে লাঠিচার্জ করে এবং কমরেড অজয় চক্রবর্তী সহ চারজনকে গ্রেপ্তার করে। হাসপাতালে বিকল্প বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা বা জেনারেটর দুরস্থান, একটি মোমবাতিও সময়মত জ্বলেনি। দোষীদের গ্রেপ্তার না করে অভিভাবকদের উপর পুলিশি লাঠিচার্জের প্রতিবাদে এবং ধৃতদের মুক্তির দাবিতে বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে ওঠে হাসপাতাল প্রাঙ্গণ। ইতিমধ্যে উপস্থিত হন হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির সদস্য ডাঃ মতিলাল গিরি, ডাঃ শান্ত মণ্ডল, ডাঃ পবন সাউ ও স্বাস্থ্যকর্মী মধুসূদন দোলুই। মৃত শিশুদের সংখ্যা বা তাঁদের সম্পর্কে কোন তথ্য যাতে কেউ জানতে না পারে তারজন্য নজিরবিহীন পুলিশি ঘেরাটোপের ব্যবস্থা করেন হাসপাতাল সুপার। এমতাবস্থায় হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির নেতৃত্বে ঘটনার উচ্চপর্যায়ের তদন্ত ও দোষীদের শাস্তি, মৃতদের যথোচিত ক্ষতিপূরণ, সর্বক্ষণের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ, অন্যথায় বিকল্প ব্যবস্থার দাবিতে বিক্ষোভ প্রবলতর হয়ে ওঠে। সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের উপর পুলিশি হেনস্থার ঘটনায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়। অবশেষে প্রবল বিক্ষোভের চাপে পুলিশ ধৃতদের মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে বিভিন্ন দাবি সম্বলিত স্মারকলিপিতে স্বাক্ষর দেন কয়েক হাজার মানুষ। পূর্বে অনুমতি দেওয়া সত্ত্বেও স্মারকলিপি জমা দিতে গেলে প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সুপার অতিশয় দুর্ব্যবহার করেন। প্রতিবাদে স্মারকলিপি জমা না দিয়েই প্রতিনিধি দল ফিরে আসেন। ঐ দিনই বিকাল ৫টায় হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির ডাকে ফুলবাগানে এক জনসভায় কমিটির নেতৃবৃন্দ হাসপাতালে চূড়ান্ত অব্যবস্থার বিরুদ্ধে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। বক্তব্য রাখেন ডাঃ তিমির দাস, কমরেডস্ অজয় চক্রবর্তী, সতীশ কর্মকার প্রমুখ।

দাম এত বেশি কেন

সাতের পাতার পর

বাড়ানোর পরও আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বৃদ্ধির যুক্তি দিয়ে আবার মূল্যবৃদ্ধির প্রস্তাব তোলা হলে, জনরোষের আশঙ্কায় সরকার ৫ শতাংশ আমদানি শুল্ক কমিয়ে দেয়, যাতে দেশের বাজারে আগের দামেই তেল বিক্রি সম্ভব হয়। এ ঘটনা প্রমাণ করে যে, সরকার চাইলেই আমদানি শুল্ক কমিয়ে দেশের মানুষকে কম দামে ডিজেল-পেট্রল দিতে পারে।

তাই একথা পরিষ্কার, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার যদি তেলের উপর বসানো তাদের নানা করের ২৫ শতাংশও হ্রাস করে তাহলেই বর্তমান দামের তুলনায় লিটার প্রতি দাম কমে যেতে পারে ৬.৫০ টাকা। কিন্তু এই কাজ না করে নানা সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার যেমন একদিকে তেল তহবিলের দেড় লক্ষ কোটি টাকা অন্য খাতে সরিয়ে দেশি-বিদেশি পুঁজির সেবায় তা ব্যবহার করেছে, অন্যদিকে আন্তর্জাতিক বাজারে দরবৃদ্ধির অজুহাতে তেলের দর বাড়িয়ে দিয়ে কর বাবদ সরকারের আয়টাও বাড়িয়ে নিচ্ছে, এরই সাথে অস্বাভাবিক করবৃদ্ধির জনবিরোধী চরিত্রকে আড়াল করতে 'আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দামবৃদ্ধি' বা 'আমদানি নির্ভরতা' ইত্যাদির ধুয়ো তুলছে। আর 'বামপন্থার' তকমা গায়ে লাগিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারগুলোর এই কুকর্মের শরিক হয়েছে সিপিএম। তাই প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে এদের সকলের বিরুদ্ধেই।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩০৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ ই-মেল ঃ suci_cc@vsnl.net